স্বয়ংসিদ্ধা

(আদি পর্ব)

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
মীনা চক্রবর্তী
১৩, বাদুরবাগান লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রিণ্টার :
বি. কে. মান্না
দেওয়ালী প্রিংটিং
২০, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

স্বয়ংসিদ্ধা আদিপর্ব

সমর্পণ

লেখকের সাহিত্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান-স্বরূপ এই গ্রন্থখানির
নব রূপায়নে প্রবৃত্ত হইয়া ঘটনাচক্রে জীবন-সংশয় রোগগ্রস্ত
অবস্থায় একান্ত সৌভাগ্যক্রমে যাঁহার দুর্লভ ব্যবস্থালাভের
সুযোগ ঘটিয়াছিল, বর্তমানে রোগমুক্ত অবস্থায় জীবনের
সেই অতিবাঞ্ছিত গ্রন্থখানি সমাপনের সামর্থে ধন্য
হইয়া দেশের সর্বজন বরেণ্য জাতির প্রাণপুরুষ

মাননীয় ও বরণীয় সুধী

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহোদয়ের

স্মরণীয় নামে

সমর্পণ করিতেছি

গুণমুগ্ধ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়

প্রায় দুই যুগ পূর্বে কাশীধামে স্বয়ংসিদ্ধার আখ্যানবস্তু পরিকল্পিত ও 'প্রবাস-জ্যোতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎকালে কাশীধামে লেখকের কর্মশালায় উক্ত পত্রিকাখানিকে অবলম্বন করিয়া একটি সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। স্বনামখ্যাত কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন কাশীতে আসিয়াছেন এবং রস-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরাই তখন আবিষ্কার করিয়াছি। বর্তমানের 'উত্তরা' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীও অনুজ লক্ষ্মণের মত আমাদের সদা-সাথী। সৃষ্টিছাড়া পুরীতে প্রথম সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশে তাহার উৎসাহই অধিক। উপরন্তু অধ্যাপক-সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সঙ্গীত-সাধক নেপালচন্দ্র রায় কবি কিরণচন্দ্র দরবেশ, পণ্ডিত হরিহর শাস্ত্রী প্রভৃতির সংযোগে গোষ্ঠী ক্রমশই পরিপুষ্ট হইতে থাকে। ঘটনাচক্রে বঙ্গ-গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ঠিক সেই সময় কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ হইতে অবসর লইয়া কাশীতে উপস্থিত। এমন সংযোগ অভাবনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদা এক বৈঠকে স্যার আশুতোষই 'প্রবাস-জ্যোতি' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের স্বয়ংসিদ্ধা উপন্যাসের প্রাথমিক অংশটুকু পড়িয়া 'বলিষ্ঠ-সাহিত্য' বলিয়া মন্তব্য করেন। তাহার প্রায় এক যুগ পরে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় উহা ধারাবাহিক রূপে বাহির হইবার পর স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি গোড়া হইতেই সকল শ্রেণীর পাঠকমহলে আদর পায় এবং সংস্করণের পর সংস্করণ বাহির হইতে থাকায় জনপ্রিয়তাও উপলব্ধি করা যায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার প্রায় এক যুগ পরে সিনেমায় যথাক্রমে বাঙলা ও হিন্দী চিত্রে রূপায়িত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষের কলা-রসিক সমাজে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে স্বয়ংসিদ্ধা ছবি উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সহিত অভিনন্দন পায়। সেই সূত্রে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় একে একে গ্রন্থখানি অনুদিত হইতে থাকে। চিত্রনাট্য রচনার সময় লেখকও 'ইউনিটে' থাকায় বস্তুতান্ত্রিকতার দিক দিয়া ঘটনারাজির কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মুদ্রিত

গ্রন্থে সেগুলি সংযুক্ত করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। কারণ, চিত্রায়নের সময় লেখকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, উপন্যাস-খানির মূল বিষয়বস্তুর মৌলিকতার জন্য সর্বকালোপযোগী হইলেও, বহু পূর্বে রচিত ঘটনারাজি বর্তমানে বহু পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে। সুতরাং আখ্যানবস্তুর মূল বস্তুটুকু বজায় রাখিয়া সময়োপযোগী নব পরিকল্পনায় নায়িকা চণ্ডীর বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাবে শিক্ষাজীবন, শিক্ষান্তে বিরোধী পক্ষের সহিত বিবিধ সংগ্রাম, শিক্ষাদাতা গুরুর মহা-প্রস্থানের পর চণ্ডীর দেশে প্রত্যাবর্তন এবং পরবর্তী জীবনেও নানা অন্তরায়ের ভিতর দিয়া তাহার অগ্রগতি প্রভৃতি সম্পূর্ণ নূতন গরিকল্পনায় ত্রুটিহীনভাবে লিখিত হইবে।

লেখকের উক্ত পরিকল্পনার প্রথমাংশ বর্তমানে আদিপর্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। গঠনমূলক সাহিত্যের এই আদর্শটি পাঠক-পাঠিকা এবং চিন্তাশীল সুধীসমাজ কর্তৃক আদৃত হইলেই লেখকের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। ইহার পরবর্তী ঘটনাবলীও সময়োপযোগী নব-কলেবরে যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত করিবার আগ্রহ রহিল।

বিশিষ্ট পুস্তক প্রতিষ্ঠান 'কলিকাতা পুস্তকালয়'এর সুযোগ্য পরিচালক শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের আগ্রহে স্বয়ংসিদ্ধা (আদিপর্ব) সুষ্ঠুভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অবতরণিকা

পূর্বাভাস ঃ বীরমূর্তির সাধনা

বাঙালী ব্যায়াম-বিদ্ অধ্যাপক বীরমূর্তির পক্ষে বীরভূমি পঞ্চনদ প্রদেশে 'বাঙালী বীর' আখ্যা লাভ বড় সাধারণ কথা নহে। তিনি এই নামেই সেখানে সুপরিচিত। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের দম্ভ, দাপট ও প্রতাপের তখন মধ্যাহ্নকাল এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সরকারের শাসন-শকট দুর্বার গতিতে চালনা করিয়া থাকে তেজস্বী বাহনযুগল পাঞ্জাবী-শিখ ও নেপালী-গুর্খা। পথনির্দেশ দেয় লেখনী-সম্বল বুদ্ধিজীবি বাঙালীর মস্তিষ্ক। এই শিক্ষিত বাঙালীর মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীকেও তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষায় তালিম দিয়া ইংরেজ ধীরে ধীরে তৈয়ারী করিয়া লইতেছিল—তাহারাও যাহাতে শিক্ষিত-পটু হইয়া নানাভাবে শাসন-শকট চালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। পরে ইহাদের সাহায্যেই ইংরেজ পৃথিবীর নানা অংশে সাম্রাজ্যবিস্তার করে—যখনই যেখানে পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালায় অতিষ্ঠ দেশবাসীর অসন্তোষ উদ্দীপিত হইয়া উঠে, তাহা প্রশমিত করিতে ইহাদিগের সাহায্যই গ্রহণ করিতে হইয়াছে ইংরেজকে। চীনদেশের হঙ্কন, আফ্রিকার ট্রান্সভাল ও সুদান, প্রাচ্যে বর্মা, মণিপুর, আফগানিস্থান এবং ভারতবর্ষে বিপ্লবী সিপাহীদের প্রথম অভ্যুত্থানের শোচনীয় পরিণতি অতীতের সেই সব কলঙ্কময় স্মৃতি বহন করিয়া থাকে। এই জন্যই বুঝি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে দীন দরিদ্র অসহায় এক বাঙালী ঋষির মস্তিষ্কের স্নায়ুপুঞ্জে বেদনার সুরে সেই স্মৃতিকথা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে—সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়শ্চিত্য পিপাসা তাঁহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলে। ইংরেজী

শিক্ষা তখন ভারতে নব যুগের আলোকপাত করিয়াছে ; সেই আদর্শে উচ্চশিক্ষিত যে সকল ভারতবাসীর চিত্ত জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্ভাসিত হইয়াছে—তাঁহারা প্রত্যেকেই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-সৌধের এক একটি স্তম্ভ স্বরূপ এবং তাঁহাদের অধিকাংশই বাঙালী। সেই অবস্থার মধ্যেই তাঁহারা শাসক ইংরেজের মুখ চাহিয়া রাখিয়া ঢাকিয়া শিক্ষিত দেশবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধের ধারা প্রচারে অবহিত ছিলেন—সাহিত্য, সঙ্গাত, মেলা, উৎসব প্রভৃতি অবদান ও অনুষ্ঠানগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া। ঊনবিংশ শতকের বাঙলার তাঁহারা দিক্‌পাল-স্বরূপ—সর্বজনবরেণ্য ও স্বনামধন্য। কিন্তু পূর্বোক্ত ঋষিকল্প, বৃত্তিবিহীন, অসহায় বাঙালী তাঁহাদের অনুবর্তী হইতে পারেন নাই ; লক্ষ্যপথ এক হইলেও তিনি দীর্ঘযাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন না, যুগোপযোগী শর্টকাট্ বা সোজা পথে—তাহা বিঘ্নবহুল হইলেও—নির্ভয়ে পাড়ি দিয়া লক্ষ্যস্থানে পঁহুছানোই কর্তব্য মনে করেন।

ঋষি বিশ্বামিত্র যখন অযোধ্যার রাজপুত্রদ্বয়কে অযোধ্যা হইতে মিথিলায় লইয়া যান, তৎকালে পথ-সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—'কোন্ পথে গন্তব্যস্থানে যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে কর ? প্রথম পথটি নিরাপদ, কিন্তু অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইতে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হইবে। আর, দ্বিতীয় পথে যাইলে বহু সময় সংক্ষেপ হইবে, তবে এ পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করা কঠিন—কারণ, হিংস্রপ্রকৃতি রাক্ষসগণ এই পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া থাকে।'

ঋষি মুখে দ্বিবিধ পথের সন্ধান পাইয়া রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্র নির্ভীককণ্ঠে বলিয়াছিলেন—'যে পথে সত্বর লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া যায়, সেই পথই প্রশস্ত! নির্ভীক যাত্রী বিঘ্ন বাধাকে পাথেয় করিয়াই যাত্রাপথে পদক্ষেপ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা বিঘ্নসঙ্কুল সোজা পথেই যাইব।'

উনবিংশ শতকের সেই তেজস্বী নির্ভীক ঋষি, যিনি জীবনে কোনদিন দাসত্ব স্বীকার করেন নাই, সঞ্চয়ের মধ্যে যাঁহার একমাত্র পুঁজি ছিল আত্মশক্তি, তাহাই সম্বল করিয়া তিনি ভারত পর্যটনে বাহির হন এবং প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া বাছিয়া বাছিয়া বারোটি মাত্র শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া সেই বিঘ্নসঙ্কুল পন্থাকেই অবলম্বন করেন। শিষ্যগণও গুরুকে সত্যকার পথ-প্রদর্শক জানিয়া নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হন।

ভারতের দুইটি প্রসিদ্ধ প্রদেশের সন্ধিস্থলে আশ্রম খুলিয়া গুরু দীক্ষিত শিষ্যগণকে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে থাকেন। তাঁহার এক হাতে থাকে গীতা, অন্য হাতে পিস্তল। গীতায় বিবৃত কর্মযোগে সিদ্ধ এবং পিস্তলের লক্ষ্যভেদে অভিজ্ঞ হইবার সাধনা চলে। একদা গুরু শিষ্যদিগকে কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় শবযাত্রীদের মিলিত কণ্ঠের 'হরিধ্বনি' শোনা গেল। সেই শব্দে শিষ্যবর্গের সহিত গুরু আশ্রমের বাহিরে আসিয়া প্রশ্ন-প্রসঙ্গে জ্ঞাত হইলেন যে, পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক ছাপোষা ব্যক্তি দারুণ দারিদ্র্যবশতঃ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অমনি গুরুর মূর্তি যেন বদলাইয়া গেল; আরক্তলোচনে শিষ্যদের পানে তাকাইয়া দৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠেন—'জানিও ইহার মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ দায়ী ইংরেজ; আর পরোক্ষভাবে দায়ী আমরা—আমাদের পিতৃপুরুষরা—যাহাদের সহায়তায় ইংরেজ সারা দেশের উপর জাঁকিয়া বসিয়া সর্বস্বশোষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাই ইহার প্রায়শ্চিত্য করিতে বসিয়াছি আমরা। এমন ভঙ্গিতে গুরু কথাগুলি বলেন, প্রত্যেক শিষ্য তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কঠিন হইয়া উঠেন—তাঁহাদের আননে দৃঢ়সঙ্কল্প ফুটিয়া উঠে।

শিক্ষা দিতে দিতে সহসা গুরু একদিন বলেন—'জানো তোমরা, বিশ্ববিধাতাকে আমি বলি যে, মৃত্যুর পর যেন আমাকে মুক্তি না দেন—আমার আত্মা যেন ভারতবাসীর আত্মার সঙ্গে মিশে

যায়, নূনত যারা জন্মাবে, আমার সঙ্কল্প যেন তাদের সহজাত সংস্কারে পরিণত হয়! তোমরাও ঈশ্বরের কাছে এই কামনা করবে।' শিষ্যগণ স্তম্ভিত হইয়া ভাবেন—'তাঁহারা এমন গুরুর শিষ্য, যিনি মৃত্যুর পর নিজের মুক্তির জন্য পাগল নহেন—ভারত ও ভারতবাসীর মুক্তিই তাঁহার এক মাত্র কাম্য।' নূতন যুগের এই মহাযোগীর নিঃস্বার্থ কামনা তাঁহাদের অন্তরেও সঞ্চারিত হইতে থাকে, সমস্বরে তাঁহারাও এই মুক্তির জয়গান গাহিয়া উঠেন।

অবশেষে দ্বাদশ শিষ্য পরিবেষ্টিত অন্তিম শয্যাশায়িত গুরু শিষ্যদিগকে তাঁহার শেষ নির্দেশ দিলেন—'মনে রাখিও, সশস্ত্র সংগ্রাম ভিন্ন দেশের মুক্তি নাই—কোনও পরাধীন দেশ সংগ্রাম ভিন্ন মুক্তি লাভ করে নাই। মুষ্টিমেয় ইংরেজ এদেশে আসিয়া শঠতার সাহায্যে দেশপতি সম্রাট হইয়া বসিয়াছে এবং এখনও তাহার অবলম্বিত নীতিকে পরিহার করে নাই। অথচ আমরা গীতার কথা —প্রাচীন ভারতের কর্মযোগের কথা ভুলিয়া গিয়াছি,—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। বর্তমানে ধনবল জনবল শস্ত্রবলে অপ্রমেয় ইংরেজকে সেই প্রাচীন নীতি অবলম্বনে দেশ হইতে তাড়াইতে হইবে। গীতার যে ব্যাখ্যা আমি করিয়াছি, তোমরা তাহার মধ্যেই কর্ম ও কর্তব্যের সন্ধান পাইয়াছ। দেশ ও জাতির স্বার্থের দিকে চাহিয়া যাহাই করিবে—অন্যের বিচারে তাহা অন্যায় বা অধর্ম হইলেও তোমাদের পক্ষে তাহা স্বধর্ম। দেশের মুক্তির জন্য যাহারা কর্মী, তাহারাই কর্মযোগী—কে তাদের কর্মের বিচার করিবে? কর্ম সার্থক হইলে পৃথিবীর ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে তাহা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বলিয়া বর্ণিত হইবে এবং সে ইতিহাস তোমরাই রচনা করিবে বিজয়ীর মনোবৃত্তি লইয়া। সুতরাং 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' এই লক্ষ্যে দৃঢ় থাকিয়া কর্মকে সার্থক করা চাইই। এ-অবস্থায় তোমাদের কর্মই হইবে প্রত্যক্ষ, কিন্তু তোমরা থাকিবে বহির্জগতের অলক্ষ্যে। সহকর্মী ভিন্ন অন্য কেহই তোমাদিগকে জানিবে না, চিনিবে না, কোন

পরিচয় পাইবে না। এমন কি, আমি তোমাদিগকে কর্মে ব্রতী করিয়াছি, দেশের মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছি, এ সত্যও কেহ জানিবেন না, তোমরাও বলিবে না। প্রাচীন ভারতের নাটকীয় চরিত্রগুলির মত আমরা আসিয়াছি গৃহীত ভূমিকার অভিনয় করিয়া যাইতে—অভিনেতারা সেখানে ভূমিকার নামেই পরিচিত থাকিতেন, দর্শক-সমাজ তাঁহাদের নামও জানিতেন না, জানিবার জন্য কৌতূহলও পোষণ করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে নাটকীয় ভূমিকাকে পিছনে রাখিয়া সেই ভূমিকার অভিনেতা নিজের নামটিকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। সর্বাগ্রে এই নামের মোহ তোমাদিগকে কাটাইতে হইবে। তোমাদের প্রত্যেকের কার্য ধারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া চাঞ্চল্য জাগাইতে থাকিবে, কিন্তু তোমরা সহজ ভাবে সমাজের মধ্যে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া থাকিবে, ইংরেজের দক্ষ গোয়েন্দাদেরও সাধ্য হইবে না তোমাদের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতে। এই খানেই তোমাদের কৃতিত্ব এবং আমার নিকট শিক্ষাগ্রহণের বৈশিষ্ট্য।'

পূর্বপুরুষদের ভুলের প্রায়শ্চিত্তে ব্রতী এই মহাপুরুষ দীর্ঘ সাধনার পর দ্বাদশটি শিষ্যের উপর অসমাপ্ত ভার অর্পণ করিয়া যে দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, শিষ্যবর্গের মনে হয়—যেন একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নীরব অশ্রুপাত ভিন্ন তাঁহারা দেশের শীর্ষ-স্থানীয় সেই মনীষীর মহাপ্রস্থান সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের মহাগুরু 'অনামী' হইয়া রহিলেন দেশ ও জাতির নিকট এবং তাঁহাদিগকেও অনামী-রূপে গুরুর এই মহা আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে। অতঃপর গুরু আজ্ঞা পালন এবং গুরুর নির্দেশমত প্রচ্ছন্নভাবে বৈপ্লবিক আদর্শে জাতিগঠন করাই হয় তাঁহাদের অবলম্বনীয় অনুষ্ঠান। প্রত্যেক শিষ্যের প্রতি গুরুর নির্দেশ থাকে, প্রত্যেকেই গুরুনির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে স্ব স্ব কর্তব্য পালন করিয়া যাইবেন। মৃত্যুর পর তাঁহারা যেমন মুক্তি কামনার পরিবর্তে মাতৃ-ভূমির অসমাপ্ত কার্য সাধনার জন্য পুনরাগমনের প্রার্থনা জানাইবেন,

তেমনই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সর্বতোভাবে আত্মরক্ষায় অবহিত থাকিবেন। মনে রাখিতে হইবে—দেশের প্রস্তুতির পূর্বে তাঁহাদের অপমৃত্যু দেশেরই অকল্যাণ ডাকিয়া আনিবে। গুরুর মতই অনামী অপ্রমত্ত অনাসক্ত ও অসন্দিগ্ধ থাকিয়া চরমদিনে পুনরাগমনের আসক্তি লইয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। এই প্রস্তুতি অবস্থায় আত্মশ্লাঘার বশবর্তী হইয়া কেহ যদি বিদেশী শাসকের দৃষ্টিতে সন্দেহ-ভাজন এবং সেই সূত্রে কোন দণ্ড প্রাপ্ত হন—তাহা হইলে বিশ্বাসহন্তা ও পতিত বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করা হইবে।

ইহা কল্প কথা নহে—সেই ঋষির আত্মা ও তাঁহার অন্তর্নিহিত দেশমুক্তির আকাঙ্ক্ষা পরবর্তীযুগে শিক্ষিত ভারতবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধের প্রেরণা সঞ্চারিত করে। সেই প্রেরণার প্রভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে ‘বন্দে মাতরম্’ মুক্তি-মন্ত্র নিঃসৃত হয়। কিন্তু সেই ঋষির সত্যকার শিষ্যগণ গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া —প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া অনামীরূপে কর্তব্য পালন করিতে থাকেন। পরবর্তী যুগে ইঁহাদের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা লইয়া যে সকল দেশপ্রেমিক কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, অবলম্বিত কার্যের ভিতর দিয়াই তাঁহারা দেশের মুক্তির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়া যথাসাধ্য কর্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন। তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্যও নির্দিষ্ট থাকে—দেশের কাজে অনামী ও অপ্রমত্ত হইয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সতর্ক চক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দেশের মধ্যে ও দেশের বাহিরে গিয়া ভারতের কাজ করিবেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই সব দেশপ্রেমিকদের নাম নাই, পরিচয় নাই, অনামী থাকিয়াই তাঁহারা এই ভাবে দেশকে জাগাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর কর্মী সাধারণভাবে জীবনযাত্রার মধ্যেই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি অব্যাহত রাখিয়া নিজস্ব অবলম্বিত বৃত্তির ভিতর দিয়া এমন ভাবে গঠন মূলক কাজে ব্রতী থাকেন যে, সন্দিগ্ধ

সরকার কোনও প্রকারে তাঁহাদিগকে ধরা ত দূরের কথা, স্পর্শ করিতেও পারেন নাই।

অধ্যাপক বীরমূর্তি ইহাদেরই একজন। বীরভূমি পঞ্চনদ প্রদেশের সুপ্ত নারীত্বকে জাগ্রত করিয়া তাঁহাদিগের অন্তরে দেশাত্মা-বোধের প্রেরণা সঞ্চারিত করিবার জন্য তিনি উপর হইতে ভার প্রাপ্ত হন। বঙ্গদেশ হইতে তখন জাতীয়তা প্রচারে বদ্ধপরিকর চারণ কবির কণ্ঠ ধ্বনি আকাশে বাতাসে ঝঙ্কার তুলিয়াছে—

না জাগিলে এই ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।

অধ্যাপক বীরমূর্তি তাঁর শিষ্যা কন্যাদিগকে এই গান শুনাইয়া বলেন—শুনছ ত, বাঙলার কবি তোমাদের জাগবার জন্য বলছেন। কিন্তু তোমরা যে জেগেছ, সে পরিচয় দেবার জন্য প্রস্তুত হও।

সে সময় ভারতেও বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের শরীর চর্চার বিধি-ব্যবস্থা সবে মাত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। বাঙালী শিক্ষাব্রতীরাই তৎকালে বিশেষভাবে আহূত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে শিক্ষা-সম্পর্কে অনুন্নত অধিবাসীদের অন্তরে শিক্ষার আলোকপাত করিতেছিলেন। অধ্যাপক বীরমূর্তি পাঠদ্দশা হইতেই অনামী দেশসেবকদের দেশাত্মবোধের বিচিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। কলিকাতার সন্নিহিত কোন সমাজশাসিত পল্লীর একান্নবর্তী পরিবার ভুক্ত বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের পুত্র তিনি। পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হইয়াও তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দার-পরিগ্রহের অনুমতি দিয়া স্বয়ং অধ্যাপনায় ব্রতী থাকেন। কালক্রমে কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনেকগুলি পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করে এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী শ্যামাপুর নামে সন্নিহিত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের বনিয়াদী অধিবাসী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কবিরাজ ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতী পুত্র করালী প্রসাদের হস্তে সমর্পিতা হন। এই মিলন পাত্র পাত্রী এবং উভয় পরিবারের পক্ষে বিশেষ আনন্দময় হয়। অধ্যাপক বীরমূর্তি তৎকালে

স্বয়ং উপাস্থিত থাকিয়া নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন—'দেখ, আকৃতি প্রকৃতি আর স্বাস্থ্য—এই তিনটি বিচার করেই আমি তোমাদের এই শুভসংযোগ ঘটিয়েছি। এর ফল আশাপ্রদ না হয়ে যায় না। অনুকে আমি শিক্ষা দিয়েছি—অন্যায় কখনো সহ্য করবে না, অন্যায়কারী যত বড় শক্তিমান হোক, তাকে ভয় করবে না। অন্নপূর্ণার সঙ্গে তুমিও করালী ঐ কথাগুলি মনে মনে জপ করবে। তাহলে তোমাদের সন্তানদের মনোবৃত্তিও এই ভাবে গঠিত হবে। তোমরা ত শুনেছ, আমি শিক্ষার ব্যাপারে বহুদিন পাঞ্জাবে কাটিয়ে এখন ইউরোপ চলেছি; যখন ফিরব তখন তোমাদের সংসার সন্তানদের কলরবে মুখরিত হয়েছে দেখব। আর—আমার এই উপদেশ কি ভাবে তোমরা পালন করেছ, তারাই সেটা আমাকে জানিয়ে দেবে।'

ফুলশয্যার রাত্রে নববধূ অন্নপূর্ণা স্বামী করালীচরণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আমার জেঠামণির সেদিনের কথাগুলো তোমার ভাল লাগেনি—নয়?

প্রশান্ত মুখে স্ত্রীর স্বাস্থ্য-সুন্দর নির্মল মুখখানির দিকে ক্ষণকাল স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া করালী উত্তরে বলেন—আজকের শুভরাতে হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কি ভেবে, জানতে পারি?

অন্নপূর্ণা একটু গম্ভীর হইয়া বলেন—জেঠামণি এমন সব কথা বলেন, লোকে শুনে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর, ওঁর আড়ালে সেই সব কথা নিয়ে কত হাসা হাসি করে। কিন্তু তাঁর সামনে মুখ তুলে বলবার মত সাধ্য কারো দেখিনি। তাই ভাবছিলুম তুমিও হয়ত, ওঁর কথা শুনে কি ভেবেছ; হয়ত—

কঠিন মুখে করালী বলিয়া উঠেন—তাঁদের মত আমিও ওঁর কথা শুনে হাসা হাসি করেছি, এই ত? কিন্তু তোমার মনে এ কথা ওঠবার মানে? তবে কি জেঠামণির কথা তোমারও ভাল লাগে নি? সেদিন আমাদের আশীর্বাদ করে পথের যে নির্দেশ দিয়েছেন তোমার

জেঠামণি, আমার মনে হলো—কেউ এভাবে সাহস করে পথ দেখাতে পারেন নি। জানো, সেইদিন থেকে আমার প্রধান চিন্তাই হয়েছে, কি করে ওঁর কথাগুলি আমরা রক্ষা করব! অবশ্য, বাবার শিক্ষায় ও তাঁর আদর্শে আমরা সদাচারী, অন্যায়ও করি না। কিন্তু উনি অন্যায়কে ঠেকাবার সম্বন্ধে জোর গলায় যে কথা বললেন, ভাবছি—সে শক্তি কি আমাদের আছে! তুমিও ওঁর কথা শুনে কি ভাবছ বলবে?

অন্নপূর্ণা একটু থামিয়া, স্বামীর দিকে অপাঙ্গে আর একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলেন—জেঠামণি যে কত কথা আমাদের বলতেন, সে সব লিখে রাখলে মস্ত একখানা কেতাব হোত। প্রফেসর মানুষ ত, ছেলেদের সঙ্গে বকা অভ্যেস, যখন যা মনে আসে বলে যান। এই যেমন বললেন—অন্যায় কখখনো করবে না, আর যে করবে তাকে ভয়ও করবে না। আচ্ছা বলত, এ কেউ পারে? ধর, দেশের রাজাই যদি কোন অন্যায় করে, আমরা তাকে ভয় করব না?

করালী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে দৃঢ় স্বরে বলেন: তোমার জেঠামণির কথা তুমিও যে এভাবে উপেক্ষা করবে, আমি তা ভাবতে পারিনি। আশ্চর্য, জেঠামণির দামী দামী কথাগুলি শুনেও তুমি মনে করে রাখনি। আমি কিন্তু এখন থেকে খুটিয়ে খুটিয়ে তোমার কাছ থেকে সেই সব কথা বার করে নেব, তাই নিয়ে ভাবব। আর শোন, জেঠামণি আশীর্বাদের সঙ্গে যে উপদেশ আমাদের দু'জনকে দিয়েছেন, এখন থেকে আমাদের কর্তব্য হবে তা পালন করা। সকালে সন্ধ্যায় আমরা দুজনে তাঁর কথাগুলি মন্ত্রের মত পাঠ করব। ঐ কথাগুলি বড় বড় হরফে লিখে বাঁধিয়ে আমাদের ঘরে টাঙিয়ে রাখব—দু-বেলা যাতে ঐ লেখায় চোখ পড়ে।

করালীর কথায় লজ্জিতা হইয়া অন্নপূর্ণা তখন নিশ্চয়ই ভাবিতেছিলেন—সত্যিই, জেঠামণিকে আমরা বুঝতে না পেরে, তাঁকে ছোট করতে গিয়ে নিজেরাই ছোট হয়ে গেলাম!

করালীর ইচ্ছা ছিল, এই বিদ্বান বিচক্ষণ আত্মীয় অধ্যাপকের চরণতলে বসিয়া কর্মসাধনা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবেন। কিন্তু এই বিবাহের পরেই তিনি ইউরোপে চলিয়া যান। করালীর আশা আর চরিতার্থ হয় নাই।

চণ্ডী : তাহার বাল্য-লীলা

দীর্ঘ কতিপয় বৎসর পরে তিনি যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, সে সময় করালীর সংসারটি সত্য সত্যই পুত্রকন্যার কলরবে মুখরিত হইয়াছে। দুঃস্থ আত্মীয়দের কতকগুলি ছেলে মেয়ে এই পরিবারটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া সংসারটিকে রীতিমত জাঁকাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সকলের উপর যে মেয়েটি তাহার অনবদ্য স্বাস্থ্য-শ্রী, বলিষ্ঠ দেহ-সৌষ্ঠব, অদ্ভুত সাহস ও নির্ভীকতায় সকলকে দাবাইয়া রীতিমত একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে—সেটি অন্নপূর্ণা দেবীর গর্ভজাতা করালীর প্রথমা কন্যা চণ্ডী। সে সময় তাহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র।

অধ্যাপক দাদুর গল্প ইহারা তাঁহাকে না দেখিয়াই অনেক আগে শুনিয়াছিল। এখন তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া দুই তিন বছর হইতে আট নয় বছরের বয়ঃক্রম বিশিষ্ট আট দশটি ছেলে মেয়ে বিলাত-প্রত্যাগত অধ্যাপক-দাদুকে দেখিতে আসে। কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রুল মুখ, উন্নত সবল দেহ-যষ্টি ও বৈচিত্র্যময় বিরাট আকৃতি দেখিয়া তাহাদের কৌতূহল আতঙ্কে পরিণত হয়—কাছে আসা দূরের কথা, অনেকটা তফাতে ত্রস্ত, বিহ্বল ও বিব্রত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। অধ্যাপক-দাদুর সস্নেহ আহ্বানও তাহাদের ভয় ভাঙ্গাইতে পারে নাই। এমনই সময় পিছন হইতে পাঁচ বছর বয়সের সেই চণ্ডী মেয়েটি তাহাদের পাশ কাটাইয়া দিব্য সপ্রতিভ ভঙ্গিতে ও অকুণ্ঠ-

ভাবে তাঁহার নিকটে গিয়া পদযুগলে মাথাটি ঠেকাইয়া ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে। দাদুও তৎক্ষণাৎ তাহাকে সস্নেহে তুলিয়া কোলের কাছে টানিয়া মাথায় হাত দিয়া বলেন—বা! দিব্যি মেয়ে ত তুমি! কি নাম বল ত?

বালিকা তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট স্বরে উত্তর দেয়—শ্রীমতী চণ্ডী দেবী।

নাম শুনিয়া প্রফুল্ল মুখে অধ্যাপক বলেন—বেশ, বেশ, খাসা নাম তোমার রাখা হয়েছে।

ঘরখানির শেষ প্রান্তে দেওয়ালের কাছে দাঁড়াইয়া অপর বালক বালিকাগুলি নির্বাক দৃষ্টিতে চণ্ডীর সহিত অধ্যাপককে দেখিতেছিল। তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—আমার দাড়ি দেখে ভয় পেয়েছ বুঝি? কিন্তু চণ্ডী কেমন নির্ভয়ে আমার কাছে এসেছে দেখ দেখি! তোমরা কেন আসছ না?

যাহাদের উদ্দেশে প্রশ্ন, এখনও তাহারা নির্বাক; কিন্তু অধ্যাপক-দাদুর কোলটি আশ্রয় করিয়া চণ্ডীই উত্তর দেয়—ওরা যে ভারি ভীতু আর বোকা।

অধ্যাপক বলেন—ভীতু সে ত দেখছি, কিন্তু বোকা বলছ কেন?

চণ্ডী তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দেয়—বোকা নয় ত কি! আমার আগেই ওরা ছুটে এসেছিল আপনার সঙ্গে ভাব করবে বলে। কিন্তু তারপর আপনাকে দেখেই জুজু ভেবে কেউ কাছে ঘেসেনি; সেই ফাঁকে আমি এসে কেমন মজাসে ভাব করে নিলুম।

—তোমার ভয় করেনি আমাকে দেখে?

—তাহ'লে কাছে এসে ভাব করি?

—কিন্তু আমি যদি এখন তোমাকে ঝুলির ভিতর পুরে নিয়ে যাই?

দেওয়ালের গায়ে গা দিয়া যে ছেলেমেয়েগুলি নীরবে ঠায় দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা একথা শুনিবা মাত্র শিহরিয়া উঠিলেও, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক এমন কঠিন কথাটা বলেন—সে কিন্তু

তৎক্ষণাৎ খিল খিল করিয়া হাসিয়া প্রশ্নকর্তাকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। তিনি মুখের শ্মশ্রু স্ফীত করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—হাসছ যে! বিশ্বাস হচ্ছে না?

চণ্ডীও নির্ভয়ে সহাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করে—আপনি কি ছেলে ধরা। তাহলে আপনার ঝুলি কোথায়?

সেই ঘরেই তক্তপোষের উপর অধ্যাপকের লটবহরের মধ্যে চামড়ার তৈয়ারী প্রকাণ্ড গ্লাডষ্টোন ব্যাগটিও ছিল। সেইটি দেখাইয়া তিনি বলেন—ওর মধ্যেই আমার সেই ঝুলি আছে।

অধ্যাপক সুনিবদ্ধ দৃষ্টিতে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন, ভাসা ভাসা ডাগর ডাগর দুটি চক্ষুর উজ্জ্বল আভা পড়িয়া তাহার মুখখানা প্রদীপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ভয়ের কোন আভাস পাওয়া যায় না। অধ্যাপক তখন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন—কি ভাবছ বল ত?

বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গি করিয়া বালিকা উত্তর দেয়—আমারও ঝুলি আছে, আপনার ঝুলির চাইতে ঢের বড়।

—বল কি? সে ঝুলি নিয়ে তুমি কি করতে চাও?

—ঐ ব্যাগ থেকে আপনি ঝুলি বার করবার আগেই সব শুদ্ধু আপনাকে আমার ঝুলিতে ভরে ফেলব।

পাঁচ বছরের বালিকার সঙ্গে সংলাপসূত্রে তার বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় পাইয়া অধ্যাপক ক্রমশঃই বিস্ময়ান্বিত হইতেছিলেন। কিন্তু তাহার মুখে শেষের এই সঙ্কল্পটি শুনিয়া তিনি কৃত্রিম আতঙ্কের ভঙ্গি মুখে ফুটাইয়া বলিয়া উঠেন—য়ঁ্যা! তাই নাকি? তাহলে ত ভারি ভাবনার কথা—আমার ঝুলির চেয়েও বড় ঝুলি তোমার আছে? কিন্তু কোথায়—দেখাতে পার?

গ্রীবাটি হেলাইয়া বালিকা উত্তর দেয়—হুঁ! তাহলে বলি, আমার ঝুলি হচ্ছে এই ঘরখানা। আপনি যেই ব্যাগটি খুলে ঝুলি বা'র করতে বসবেন, আমিও তখনি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ঘরের

দরজার কড়ায় কুলুপ লাগিয়ে দেব, আর বেরুতে পারবেন না। কেমন মজা!

কথা-প্রসঙ্গে এই বয়সের বালিকার মুখে এই ধরণের কথা শুনিয়া অধ্যাপক বীরমূর্তি চমৎকৃত হন, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবতে থাকেন যে, ইউরোপে গিয়ে শিক্ষার ব্যাপারে কত ছেলে মেয়ের সহিত তাঁহাকে আলাপ করতে হইয়াছে—স্বাধীন দেশের আবহাওয়ায় লালিত ও বর্দ্ধিত বালক বালিকাদের সহজাত প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্ত চিত্তের কত বিচিত্র ভাবের সন্ধান তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সহিত তুলনায় সকল দিকেই অনগ্রসর পরাধীন দেশ ও জাতির ভিতর হইতে পঞ্চম বর্ষীয়া এই বালিকাটি সহজ ও স্বাভাবিক কথোপকথনের মধ্যে যে সাহস, নির্ভীকতা ও বাকপটুতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিবার নহে!

বালিকার প্রশ্নে তাঁহার চিন্তাজাল সহসা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কৌতুকদীপ্ত চক্ষুর দৃষ্টি অধ্যাপক দাদুর মুখে নিবদ্ধ করিয়া চণ্ডী জিজ্ঞাসা করে চুপ করে; রইলেন যে! আমার ঝুলি দেখে ভয় পেয়েছেন?

অধ্যাপক বলেন: হ্যাঁ, ভয় যে পাইনি তা নয়, কিন্তু তার চেয়ে দুঃখটাই বেশী।

চণ্ডী: কেন?

অধ্যাপক: দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, তুমি ভারি একটা অন্যায় করেছ।

চণ্ডী: আমি অন্যায় করেছি!

অধ্যাপক: করছ না? কতকাল পরে দাদু এলেন তোমাদের ঘরে; আর তুমি কি না সেই ঘরখানাকে ঝুলি বানিয়ে দাদুকে ধরে রাখতে চাও?

বালিকার কোমল মুখখানির উপর বিস্ময়ের রেখা ফুটিতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠে: বা-রে! আপনিই ত

আগে ঝুলির কথা বলে ভয় দেখালেন! তাই ত, আমিও আপনাকে ভয় দেখিয়েছি। আপনি অন্যায় করলে, আমি ভয় পেয়ে বুঝি চুপ করে থাকব—ভেবেছেন? সে মেয়ে আমি নই।

বালিকার কথায় অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করেন: অন্যায় কেউ করলে তুমি তাহলে ভয় পাও না?

বালিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়: না। বাবা আমাকে বলেছেন যে, নিজে যেমন অন্যায় কিছু করবে না, কেউ অন্যায় করলেও তেমনি চুপ করে থাকবে না, ভয় পাবে না।

অধ্যাপক: বটে! তাহলে এই নিয়ে অনেকের সঙ্গে তোমার ঝগড়াঝাঁটি হয় বল?

দেওয়ালের গায়ে গা দিয়া যাহারা এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের ভিতর হইতে দশ এগারো বছরের একটি বালক এই সময় বলিয়া উঠিল: ও মেয়ে কাউকে 'কেয়ার' করে নাকি? আমাদের সঙ্গেই কোমরে আঁচল বেঁধে ঝগড়া করতে আসে। সাধ করে কি আমরা ওকে দস্যি মেয়ে বলি?

চণ্ডী ঝাঁ করিয়া প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলিল: আচ্ছা দাদু, জিজ্ঞাসা করুন তো ওকে, কেন সেদিন দস্যিপণা করেছিলুম!

অধ্যাপক গম্ভীর মুখে বলিলেন: তুমিই বল দিদি কি হয়েছিল—আমি শুনবো।

চণ্ডী অভিযোগের ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল: পাড়ার ডানপিটে ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে মিশে গাছ থেকে পাখীর বাসা খোঁজা, আর খুঁজে পেলে বাচ্চাগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে হুল্লোড় করা ছিল ওঁদের খেলা!

অধ্যাপক: ছেলেগুলো ভারি দুষ্টু তো! তারপর কি হলো শুনি?

গল্পের মত এমন ভাবে গুছাইয়া এই বয়সের মেয়েটি সেই ঘটনাগুলি স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বলিতে আরম্ভ করিল যে, অধ্যাপক

দাদুর মনে হইল, যেন সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যটি তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখিতেছেন ?

চণ্ডী বলিতে লাগিল : আমাদের খিড়কীর বাগানের ঠিক মাঝখানে যে মস্ত পুকুরটি আছে, তার পশ্চিম পাড়ে পাশাপাশি চারটে আম গাছ, আর তার পর মস্ত একটা বাতাপি লেবুর গাছ। এখন হয়েছে কি, রাজ্যের যত পাখী—ঐ কটা আম গাছের ডালেই তাদের বাসা বাঁধবে, আর ছেলেগুলো তাদের খোয়ার করবে। এর জন্যে বাবা বারণ করেছেন, মা বারণ করেছেন, পাড়ার লোক বারণ করেছেন, কারুর মানা ওরা শুনতে চায় না। আর পাখীগুলোও এমনি বেহায়া, ঐ গাছ ছাড়া যেন তাদের ডিম পাড়বার আর জায়গাই নেই। ছেলেগুলোর এই অন্যায় আচরণ আমি আর সইতে পারলুম না দাদু, ভগবানও যেন আমাকে একটা উপায় দেখিয়ে দিলেন। এর পর ওরা সবাই দল বেঁধে পাখীর বাসা ভাঙবার মতলব করছে শুনে, সেই উপায়টি আমিও কাজে লাগিয়ে দিলুম।

অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন : উপায় কি দিদি ?

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী কহিলেন : ঐ যে বাতাপি লেবুর গাছটির কথা বলেছি, তারই একটা ডালে মস্ত এক মৌচাক হয়েছিল, সেটি কারুর নজরে পড়েনি। আমি করলুম কি, সেই ডালটি আস্তে আস্তে গোলঞ্চর লতার সঙ্গে জড়িয়ে বেড় দিয়ে আম গাছের ডালের সঙ্গে এমন কায়দা করে বেঁধে দিলুম—ডালে ভার পড়লেই মৌচাকে ঘা পড়বে। এর পর যেই ওরা দল বেঁধে গাছে উঠে হল্লা তুলে গাছের ডাল নাড়া দিয়েছে ধাড়ী পাখীগুলোকে তাড়াবার জন্যে, অমনি চাকের মৌমাছিগুলো রেগে বেরিয়ে এসে ওদের ছেঁকে ধরলো। তখন ওদের স্ফূর্তি মাথায় উঠল, মৌমাছির কামড়ে কি কান্না। পাড়ার লোক ছুটে এসে কাণ্ড দেখে বললে,—ঠিক হয়েছে ; এমন অন্যায় আর করবে ?

বালিকাকে নিবিড়ভাবে কোলে টানিয়া লইয়া অধ্যাপক বলেন :
—বা, বা, বা, তুমি ত দেখ্‌ছি বাহাদুর মেয়ে!

তফাতে যে ছেলেমেয়েগুলি এতক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের ভিতর হইতে একজন এই সময় সাহস করিয়া বলিয়া উঠে : ও হোচ্ছে দস্যি মেয়ে। তাইতো ওকে চণ্ডী বলে।

ওষ্ঠ দুটি ফুলাইয়া অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বালিকা অভিযোগের ভঙ্গিতে বলিতে থাকে : আচ্ছা দাদু, আপনি বলুন ত, মেয়ে হয়েছি বলে কি ছেলেরা আমাদের পোকামাকড় মনে করবে? কথায় কথায় বলে—আমরা না কি বেলে মাছ! শুনে আমার যা রাগ হয়। মেয়ে হয়েছি বলে এতো হেনস্তা। আচ্ছা, তাহলে—মা দুর্গাকে সবাই মানে কেন? তিনি ত মেয়ে হয়ে অসুরদের বধ করেছিলেন—তবে?

অধ্যাপক স্নিগ্ধ স্বরে বলিয়া উঠেন ঠিক বলেছ দিদি, তোমরা সেই মহাশক্তির কায়া, তোমাদের যারা তুচ্ছ ভেবে হেনস্থা করে, তারা মূর্খ। ইচ্ছা করলেই তোমরা নিজের শক্তি বিকাশ করে, তাঁরই মত শক্তিময়ী হতে পার।

বিপুল উল্লাসে বালিকার আনন স্ফুরিত হইয়া উঠে, সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করে : পারব দাদু—সত্যিই পারব?

অধ্যাপক দাদু দৃঢ় স্বরে উত্তর দেন—নিশ্চয়ই পারবে। তবে দিদি এর জন্যে শিক্ষা চাই, দীক্ষা চাই, সাধনা চাই। আমি বলছি—তুমি পারবে; তার কারণ···এ শিক্ষার হাতে-খড়ি তোমার আগেই হয়ে গেছে—এই বয়সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে শিখেছ।

সেই দিনই অধ্যাপক জামাতা করালীকে নিভৃতে ডাকিয়া বলেন : তোমার কন্যা চণ্ডীকে দেখে, আর তার কথা শুনে আমি বড়ই আনন্দ পেয়েছি। ওদেশে যাবার সময় যে কথগুলি তোমাদের দুজনকে আমি বলে গিয়েছিলাম, তোমরা সেগুলো কাজে লাগিয়েছো, তোমাদের মেয়ে চণ্ডীই আমাকে সেটা জানিয়ে দিয়েছে।

করালী বলেনঃ এক অদ্ভুত ক্ষণে দৈব প্রতিভা নিয়ে ঐ মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে জেঠামণি! দু'বছর বয়স থেকেই ও যে-সব কথাবার্তা বলতে থাকে, আমরা শুনে অবাক হয়ে যাই। আপনার উপদেশ ওকে একদিন মাত্র শুনিয়েছিলাম—অন্যায় কখনো করবে না, আর যে অন্যায় করে তাকে দেখে ভয় পাবে না। কথাগুলি শুনে ও মেয়ে আমাকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করে জেঠামণি—অন্যায় কাকে বলে, লোকে কেন অন্যায় করে, তার পর—অন্যায় করা যখন খুব খারাপ কাজ, অন্যায় করে তাদের মুখ দেখাতে লজ্জা করে না? নিজের মনে বিড় বিড় করে এই সব কথা বলে, আর—আর যেখানে মনে খোঁকা লাগে, বুঝতে পারে না—ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে তবে নিশ্চিন্ত হয়। শুধু কি তাই, ভয় ডরের কোন তোয়াক্কাই রাখে না; ভয়ের কথা কেউ বললে হাসে। দুপুর রাতে ওকে ডেকে বলুন না—সচ্ছন্দে ও ডাকাতের পুকুর থেকে জল তুলে আনবে—দিনের বেলায় যেখানে একলা যেতে ছেলেদের মন ভয়ে ছম্-ছম্ করে।

এমনই অনেক কথাই করালীচরণ জেঠামণিকে শুনাইয়া দিলেন—এই বয়সের মেয়ের সম্বন্ধে যে-সব কথা খুবই বিস্ময়জনক। সবিশেষ শুনিয়া অধ্যাপক বলিলেনঃ এখন আমার একটি অনুরোধ যদি তোমরা রাখ, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য তাহলে সিদ্ধ হয়।

করালী বলিলেনঃ সচ্ছন্দে বলুন, এতে কুণ্ঠিত হবার কি আছে?

অধ্যাপক বলিলেনঃ এই মেয়েটিকে আমার হাতে দাও। তোমরা বোধ হয় শুনেছ, এখান থেকে পাঞ্জাবে গিয়েই আমাকে কাজ করতে হবে। আমার মনে একটা আগ্রহ হয়েছে, ওখানে কতকগুলি প্রতিভাময়ী বালিকা নিয়ে তাদের মনের মত করে তৈরী করি। এই মেয়েটিই হবে আমার মুখপাত; একে নমুনার মত রেখে আর সব ছাত্রী যোগাড় করে নেব। উপযুক্ত শিক্ষার আলো দেখিয়ে—মেয়েদের অন্তরে ঘুমিয়ে থাকেন যে ভগবতী, তাঁকে জাগিয়ে তুলে কালক্রমে তাদের 'জাগ্রতা ভগবতী' করে তুলব।

করালী প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, জেঠামণি বুঝি পরিহাস করিয়াই কথাগুলি শুনাইলেন। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে কথার সুরে বুঝিলেন যে, তিনি তাঁর অন্তরের কথাই বলিয়াছেন। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করিয়া জেঠামণিকে বলিলেন: বেশ, চণ্ডীকে আপনি নিয়ে যান জেঠামণি, এই বয়সেই ওর যে রকম বুদ্ধিশুদ্ধি দেখি, তাতে এখানে ওর কদর বুঝে আমরা ঠিক মত ওকে গড়ে তুলতে পারব না, হয় ত বা শেষে—শিব গড়তে বাঁদর তৈরী করে বসব। আপনিই ওকে তৈরী করুন জেঠামণি—তাহলে সত্যিই চণ্ডী মেয়ের মত মেয়ে হবে।

জেঠামণি বলিলেন: তাহলে বলি বাপু বারোটি বছর তোমাদের ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। যদি ওদিকে তোমরা কখনো যাও, দেখা-সাক্ষাৎ হবে, নতুবা—বারো বছর পরে চণ্ডী আবার ফিরে আসবে তোমাদের কাছে। তখন তোমরা আজকের কথাগুলো মিলিয়ে নেবে।

ভগবতী-বিদ্যাপীঠ: চণ্ডীর শিক্ষা

ইহার পর অধ্যাপক বীরমূর্তি চণ্ডীকে লইয়া তাঁহার কর্মস্থান পাঞ্জাব প্রদেশের পুণ্যভূমি অমৃতসরে উপনীত হন। স্থানীয় কোন প্রসিদ্ধ কলেজে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত রূপে ব্যায়াম শিক্ষাদানের দায়িত্বও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু 'ভগবতী বিদ্যাপীঠ' নামক কন্যা প্রতিষ্ঠানটির প্রবর্তক ও পরিচালক তিনি স্বয়ং। অল্পবয়স্ক বালিকা-দিগকে গোড়া হইতে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া গঠন করিয়া তুলিবার অভিনব পরিকল্পনা লইয়াই তিনি এই বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁহার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে বালিকারা শিক্ষালাভ করে—সে শিক্ষার ধারাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে তিনি এক বিরাট জনসভায় দেশের নেতৃবর্গ, শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, ধনাঢ্য, অভিজাতসম্প্রদায় ও

বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের সমক্ষে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি দিলেন যে, জগতের ইতিহাসের পাতা উল্টাইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে—বুদ্ধির প্রাচুর্যে, জ্ঞানের উৎকর্ষে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, কবিত্বে, শিল্প ও রাষ্ট্রীয় নৈপুণ্যে দেশ কাল নির্বিশেষে যে-সব অসাধারণ প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে—সেই অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হইতেছেন এক একটি পুরুষ; তাঁহারাই দীপ্তিমান জ্যোতিষ্কের মত এক একটি দিগন্ত আলোকিত করিয়া বিরাজমান! এক একটি শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিগন্তে বিভিন্ন রূপে কত পুরুষকেই দীপ্তিমান দেখি, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের কথা—সেখানে নারীর স্থান নাই বলিলেই হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশ হইতে অন্তত উনিশ জন মহাপুরুষ মাথা তুলিয়া সমগ্র ভারতের বরেণ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে নাম সংযোগ করিবার মত এমন একটি নারীর নামও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—এক ডাকেই সারা দেশবাসী যাঁহাকে চিনিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বীরত্বে বহু ভারতবাসী অতিমানুষ রূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু নারীর মধ্যে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ভিন্ন অন্য কোন নারীর নাম জানা নাই। ওদেশেও কত মহামানবের নাম আমরা জানি, কিন্তু নারী-প্রসঙ্গে বীরত্বে জোয়ান আর্ক এবং বিদ্যায় মেরী কুরী ছাড়া কোন মহীয়সী নারী খুঁজিয়া পাই না। অথচ প্রাচীন ভারতের এমন বহু নারীর নাম আমাদের জানা আছে যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী মহামানবী রূপে দেবীর মত নমস্যা হইয়া আছেন। বর্তমান যুগের নারীজাতি যাঁহাদের এই দীনতা সত্ত্বেও পুরুষের সমান অধিকার ও ক্ষমতা লাভের দাবী করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হইতেছে, কোন কিছু দাবী করিবার পূর্বে ইহাই প্রতিপন্ন করা চাই যে, ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্যকরূপে তাহার আয়ত্ত হইয়াছে। অধিকাংশ পুরুষের ধারণা ইহাই যে, দৈহিক শক্তির মত নারীজাতি মানসিক শক্তিতে পুরুষের

সমকক্ষ নহে। কিন্তু আমি বলিব, তাঁহাদের এই ধারণা ভুল। কোনরূপ শক্তিতেই নারীজাতি পুরুষ অপেক্ষা কম নহে। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর দৈহিক শক্তির কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। অবরুদ্ধ দুর্গ ত্যাগ কালে পীঠের দিকে তাঁর বালক পুত্রকে একখানা শালের মধ্যে বাঁধিয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া ঘোড়ার পীঠে একশো মাইল তফাতে নিরাপদ ঘাঁটিতে গিয়া উঠিয়াছিলেন তিনি। পিছনে অনুসরণকারী দক্ষ ঘোড়সওয়ারেরাও তাঁর নাগাল পান নাই। পরে, গোয়ালিয়রে আহতা অবস্থাতেও তিনি একাকিনী দুই জন ইউরোপীয় যোদ্ধাকে প্রতি আক্রমণ করিয়া শমন সদনে পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য, শিক্ষা ও সাধনার বলে সেই শক্তি তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং শৈশব হইতে অভ্যস্ত হইলে প্রত্যেক বালিকা স্বাস্থ্যবতী ও শক্তিমতী হইতে পারেন। আমি বলিব, কি দৈহিক শক্তি, কি মননশক্তি, কি বিদ্যাশক্তি প্রত্যেকটির অনুশীলনে পুরুষজাতিই সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা লাভ করায় তাহারা ঐ সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে, আর দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলনের অভাবেই নারী-প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলে কৃত্রিম অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। সাধারণ গৃহকর্মের জালে নারীদিগকে জড়াইয়া রাখিয়াই আমরা ভাবি, তাহাদের উপর কত বড় দায়িত্বভারই না দিয়াছি! কিন্তু বুদ্ধি গৌরব দেখাইবার মত অবস্থায় অর্থাৎ পারিবারিক যে সকল ব্যাপারে বুদ্ধিপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে, যে-পথে সমাজ সমক্ষে পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ রহিয়াছে, যে আমরা নারীদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা দিয়া থাকি। শক্তিরূপা, দেবীরূপিনী, সর্বময়ী প্রভৃতি যে-সব বাক্যে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা অসার স্তুতিবাদ; পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষই জানেন যে, এগুলি নিরর্থক—ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। দুর্বল ব্যক্তির মহত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 'বীর' বলিয়া পরিতুষ্ট করিবার মত

অবাস্তব। নারী সম্বন্ধে এমনই মুখে বা কাগজে কলমে শক্তিময়ী মনস্বিনী প্রভৃতি বিশেষণ ব্যাজস্তুতির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এখন আমি বলিতে চাই যে, আমাদের ভুলের এই পথ হইতে নারীদিগকে ফিরাইতে হইবে—যাহাতে তাহারা সত্যই শক্তিময়ী হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে। করুণা করিয়া নহে, নারীর বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া পুরুষজাতি তথাকথিত শ্রদ্ধা ও সম্মানের অর্ঘ যাহাতে দান করে। এমন ভাবে শৈশব হইতে নারীগঠনের আয়োজন করিতে হইবে—প্রত্যেক কন্যা জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আত্মশক্তি লাভের আহ্বান শুনিতে পায়, এবং সেই সঙ্গে অন্ধ সংস্কারের শৃঙ্খলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। এই শিক্ষা সার্থক হইলেই নারীর প্রশস্ত চিত্তের যথার্থ প্রেমও প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবে—যে প্রেম আত্মশক্তির আলোকে বলিষ্ঠ মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া নারীর নিজস্ব প্রেমাত্মক ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হয়। আত্মত্যাগী বুদ্ধ ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মত প্রেমের রাজ্যেও নারীর অজেয়া হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দেশকে জাগাইতে হইলে জাতিকে গঠন করিতে হইবে। কিন্তু নারীকে বাদ দিয়া জাতি গঠনের প্রচেষ্টা অগ্নির সাহায্য না লইয়া খাদ্য প্রস্তুতের মত বাতুলতা মাত্র। এইজন্যই বাঙলা দেশের কোন দেশভক্ত মনীষী একটিমাত্র আত্মপ্রত্যায়শীলা মহিলার অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া উদ্দীপিতকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

'না জাগিলে এই ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা, জাগেনা।'

নারীদের সম্বন্ধে অনেকেই অনেক বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন, সেই সকল কথা শুনিতেই সকলে অভ্যস্ত হইয়াছেন ; কিন্তু এদিনের সভায় অধ্যাপক বীরমুর্তির বক্তৃতা নারীলোকের উপর যেন নূতন আলোকপাত করিল। সভায় দেশমান্য নেতৃস্থানায় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন,

প্রদেশে বহু প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী এবং প্রতিষ্ঠাপন্ন শিল্পপতি ছিলেন; আইনজীবী, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক ও বহু শিক্ষাব্রতী সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন;—আর—যাঁহাদের সম্পর্কে আলোচনা, তাঁহারা ত সভাক্ষেত্রে একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেনই। বীরমূর্তির স্পষ্ট কথাগুলি সকল শ্রেণীর দর্শককেই আনন্দিত ও আশান্বিত করিয়া তুলে।

জলন্ধরের নেতৃস্থানীয় নৃপকল্প তালুকদার, সরদার ভগবতী প্রসাদ অধ্যাপকের যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া এতই আশান্বিত হন যে, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেনঃ অধ্যাপক বীরমূর্তির হিম্মত আমরা জানি। তিনি যে ইচ্ছা করিলে আমাদের দেশের জানানাগুলিকে ভগবতীর মত শক্তিমতী করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাজটিও ত সাধারণ নয়। সরকার মদত দেবেন না; তাঁরা চান, আমাদের দেশের আওরতগুলিকে ওঁদের দেশের ছাঁচে ঢালিয়া বিবি বানাইতে। দেবীর প্রতি তাঁহাদের আস্থা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা যদি দেবী হইতে না পারেন, তাহা হইলে আমরাও দানব হইয়া যাইব, দেবতার নাগাল পাইব না। আমাদের এখন উচিত, বীরমূর্তিজীকে রীতিমত মদত দেওয়া। আমিই প্রথমে পথ দেখাইতে চাই; আর এখনই কাজ যাহাতে চালু হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই সহরে বত্রিশ বিঘা জমির উপর তৈয়ারী আমার যে বাগানবাড়ী পড়িয়া আছে, তাহা এই ভগবতী বিদ্যাপীঠকে আমি দান করিতেছি। এই মোকামেই বিদ্যাপীঠ চালু হৌক এবং বিদ্যাপীঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য একটা তহবিলও কায়েম হওয়া চাই! আমি তাহাতে এই জিলার বৎসর সালিয়ানা নিট দশ হাজার টাকার আয়ের আমার একখানা তালুক বন্দোবস্ত করিয়া দিবার সোহরত করিতেছি।

বর্ষীয়ান মহাসম্ভ্রান্ত তালুকদারের এই বিরাট দান দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া আরও অনেক দাতাকে প্ররোচিত করিল। তাঁহারাও উক্ত

তহবিলে নানাভাবে দানের উল্লেখ করিয়া বিদ্যাপীঠকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। উপসংহারে অধ্যাপক বীরমূর্তি সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সংক্ষেপে বলিলেন: অনেক সময় আমরা দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণকর কাজে হাত দিতে শঙ্কিত হইয়া থাকি, তাহার আর্থিক দিকটা চিন্তা করিয়া। কিন্তু নিষ্ঠা সহকারে সাহসপূর্বক কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িলে সে চিন্তারও অবসান হইয়া থাকে। কাজে নামিয়া পড়িলে এবং কর্মীর প্রতি লোকমত আস্থাশীল থাকিলে কিছুই আটকায় না। আমি আজ আপনাদিগকে যে আশার কথা শুনাইয়াছি সে আশা কতকটা পূর্ণ হইয়াছে যে দিন বুঝিব, সে দিন আপনাদের চোখের সামনে ভগবতী বিদ্যাপীঠের দরজা খুলিয়া দিব ; সেদিন আপনারা এইভাবে সমবেত হইয়া কন্যা ভগবতীদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবেন। সে দিনও যদি এইভাবে আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ আহরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া ধন্য হইব।

ইহার পর দীর্ঘ একটি যুগ ধরিয়া ভগবতী বিদ্যাপীঠ সহরবাসীর বিপুল কৌতূহল, বিবিধ জল্পনা-কল্পনা' অসংখ্য আগ্রহব্যাকুল চিত্তের প্রতীক্ষার সম্মুখে অচলায়তনের মত রহস্যময় হইয়াই বিরাজমান থাকে। ধীরে ধীরে বর্ষে বর্ষে বিদ্যাপীঠের আয়তন বাড়িয়া চলিয়াছে ; সন্নিহিত নদীর সহিত লহর টানিয়া নূতন সংলগ্ন জলাভূমিকে স্রোতস্বিনীর মত বেগময়ী করা হইয়াছে ; জনরব কন্যা ভগবতীদের সেখানে সাঁতার শিক্ষা চলে। সুবিস্তীর্ণ বিদ্যায়তনের চারি দিকে গগনস্পর্শী সুউচ্চ প্রাচীর, বাহির হইতে ভিতরের অবস্থা দেখিবার উপায় নাই। রূপকথার রাজ্যের মত প্রায়ই বিদ্যাপীঠের অদৃশ্য অন্তরদেশ হইতে রহস্যের ধূম্রজাল উঠিয়া তরুণ মহলের চঞ্চল চিত্তে রোমাঞ্চের শিহরণ জাগাইয়া থাকে। মধ্যে বিদ্যাপীঠের বিশাল অঙ্গনে যুগপৎ বহু অশ্বের ক্ষুরধ্বনি নাকি নিশীথ যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেয়। কোন কোন দুর্যোগময়ী রাত্রির আতঙ্কময় পরিবেশ-

মধ্যে মেঘগর্জনের তালে তালে পিস্তলের গুলিবর্ষণের ধ্বনি গর্জন করিয়া ওঠে। যদিও মেঘের ধ্বনির সঙ্গে সেই তীব্র নিনাদ মিশিয়া যায়—বাহিরের কাহারও সংশয় করিবার কিছু থাকে না; কিন্তু অনুসন্ধিৎসু কৌতূহলী মহলের জাগ্রত কর্ণকে প্রতারিত করাও সহজ সাধ্য নহে। কোথাকার কোন্ রাজ ষ্টেটের অশ্বশালা হইতে অতি সন্তর্পণে ও সংগোপনে মেঘের মত কালো ও শিখিপুচ্ছের মত সুমসৃণ অশ্বপাল বিদ্যাপীঠে আসিয়া থাকে এবং ইহাদের সম্পর্কে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান বিবিধ উপকরণ যোগাইয়া বিদ্যাপীঠের বিদ্যা-সাধিকাদের সাধনায় সহায়তা করে, এ সকল তথ্যও অনুসন্ধিৎসুদের কৌতূহলে ইন্ধন যোগাইয়া থাকে।

কিন্তু বিদ্যাপীঠের অভ্যন্তরে থাকিয়া বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া যাহাদের সাধনা চলিয়াছে, তাহারা বাহিরের কোন ব্যাপারেই কিছুমাত্র কৌতূহলী নহে। কোন দিকেই তাহাদের দৃক্পাত নাই; আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের আলোকপাত হইয়াছে তাহাদের তরুণ মনগুলির উপর। গুরু এবং বিদ্যা ভিন্ন অন্য কোন দিকে তাহাদের লক্ষ্যপাতের অবসর নাই। প্রতি বৎসর বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষ্যে ছাত্রীদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে কিছু কিছু আলোকপাত হইয়া থাকে—কেবলমাত্র ইহার পৃষ্ঠপোষকস্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট সুধী সজ্জনের কৌতূহলী দৃষ্টির সমক্ষে। প্রতিবৎসরই কিছু না কিছু উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—মানসিক বিদ্যায় ও শারীরিক শক্তির চর্চায়। কিন্তু প্রথম দিনটির মত প্রতিবৎসরই তিনি অভ্যাগত ও অভিভাবকবর্গকে আশ্বাস দিয়া থাকেন যে, দ্বাদশ বৎসর উৎসবে পরিপূর্তির এক দল ছাত্রী তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিবে এবং সেই দিন তাহাদের সত্যকার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অবশেষে সেই বাঞ্ছিত দিনটি উপস্থিত হইয়াছে! যাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া জনপ্রবাদ ও লোককণ্ঠ হইতে বার্তা আহরণ করিয়া

বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছে এবং সহর ও সমাজের নানা শ্রেণীর সুধীবর্গ—যাঁহাদের স্মৃতিতে অতীতের সেই স্মরণীয় দিনটির স্বাক্ষর এখনও রহিয়াছে, তাঁহাদের অসীম ধৈর্যের বন্ধনও খুলিয়া গিয়াছে।

আখ্যায়িকাটির ইহাই পূর্বাভাষ।

॥ এক ॥

অমৃতসরের বে-সরকারী নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 'ভগবতী বিদ্যাপীঠ'-এর সিংহদ্বারটি এতদিনে সর্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে উদ্ঘাটিত হইবে—এই সংবাদ শুধু অমৃতসর সহরে নহে, সারা প্রদেশের প্রসিদ্ধ অঞ্চলগুলির বক্ষেও কৌতূহলকন্দলিত চাঞ্চল্যের শিহরণ তুলিয়াছে। এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে অধ্যাপক বীরমূর্তির কণ্ঠোচ্চারিত আশ্বাস বাণী দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে পুনরায় নূতন সুরে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে ঃ

দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে নারী জাতি কোন অংশেই যে পুরুষের অপেক্ষা ন্যূন নহে--যে-দিন শিক্ষিতা নারীরাই হাতেকলমে সকলের সমক্ষে এই উক্তি প্রতিপন্ন করিবার মত পটিয়সী হইবেন—সেই দিন ভগবতী বিদ্যাপীঠের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উদ্ঘাটিত হইবে। দেশবাসী এই বিদ্যায়তনেই কন্যা-ভগবতীদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবেন।

বড় সাধারণ কথা নহে। বারো বৎসর ধরিয়া অধ্যাপক বীরমূর্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে দুর্ভেদ্য অচলায়তনের অভ্যন্তরে সংগোপনে কি কাণ্ড করিয়াছেন, দেশের নানা স্থান হইতে মেয়েদের আনাইয়া শিখাইয়া পড়াইয়া কিভাবে শিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছেন, যাহাদিগকে লইয়া সারা সহরে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই—এতদিনে তাহারা সবার সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে। কেবল মাত্র নগরবাসী পুরুষরাই নহে, নারীমহলেও রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি তাহারা ভগবতী বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের শিক্ষা দীক্ষায়

অসাধারণত্ব কিছু দেখিতে পায়, তবে তাহারাও অতঃপর বিদ্যাপীঠে গিয়া শিক্ষা আরম্ভ করিবে। শুধু অমৃতসর সহরে নহে—সন্নিহিত স্থানগুলিতেও এই প্রসঙ্গে কত কথাই চলিয়াছে। সকলেই কৌতূহলী, নির্দিষ্ট দিনটির প্রতীক্ষায় একান্ত উদ্‌গ্রীব।

অমৃতসর সহরের বিভিন্ন পল্লীর গৃহে গৃহে যখন ভগবতী বিদ্যাপীঠের দ্বারোদ্ঘাটন দিনটির সম্বন্ধে এই ভাবে জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে, সেই সময় সহরের প্রান্তভাগে 'পাঞ্জাব নার্সিং হোম' নামে নব প্রতিষ্ঠিত একটি আধুনিক প্রণালীর আরোগ্য নিকেতনের অভ্যন্তরে মুখোমুখি বসিয়া দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্পর্কেই আলোচনা করিতেছিলেন।

বয়স দুইজনের প্রায় সমান—বত্রিশের মধ্যে। কিন্তু দৈহিক গঠনে ও বেশভূষায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। একজনের মুখখানা যেমন ভারী, তেমনি মাংসল, দাড়ি গোঁফ ক্ষৌরিত, চিবুক অত্যন্ত চওড়া নাক মোটা ও অস্থিময়, চোখ দুটি বড় বড় ও উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ চেহারা, দেহ প্রশস্ত ও মজবুত। গায়ের রঙ লালচে গৌরবর্ণ। পরণে টাইট পা-জামা বা ইজেল, তাহার উপর কালো রঙের আচকান; মাথায় ধুসর বর্ণের গোল টুপী, তার গায়ে সাচ্চা জরীর সূক্ষ্ম কারুকাজ। ভদ্রলোকের নাম সরদার দেবীপ্রসাদ। ভগবতী-প্রসাদ নামে জলন্ধরের যে তালুকদার ভগবতী বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠায় প্রচুর সাহায্যে করেন, তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র এই দেবীপ্রসাদ।

অপর ব্যক্তির মুখখানি চমৎকার ধারালো ও সুশ্রী, মুখের উপরের সুবিন্যস্ত গোঁফ জোড়াটির উভয় প্রান্ত এমন কায়দায় পাকানো যে, চিত্রকরের তুলিতে চিত্রিত চিত্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। গোঁফের সঙ্গে মিলাইয়া লম্বা দাড়ীর তলার দিকটা সরু করিয়া ছাঁটা —এমন সূক্ষ্ম ফেন্স্‌কাট কদাচীৎ দেখা যায়। নাক টিকালো, চোখ দুটি বড় না হইলেও তাহাতে দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছ আলো জ্বল জ্বল করিতেছে। দোহারা নধর চেহারার মানুষ, সাধারণ গৌরবর্ণ।

ইহার বেশভূষা অনেকটা ইউরোপীয়দের মত, কেবল মাথার টুপীটা গোলাকার—আগের ভদ্রলোকের মাথার টুপীর মতই ; তবে ইহার উপর কোন কারুকার্য নাই। ইনিই এই পাঞ্জাব নার্সিং হোম নামক আরোগ্যশালার পরিচালক ও প্রধান চিকিৎসক বি, এল, বি ওরফে বিহারীলাল বিশ্বাস—বিলেত ফেরৎ নাম করা ডাক্তার বলিয়া অভিহিত।

উভয়ে সামনাসামনি দুইখানি কৌচের উপর উপবিষ্ট। ডাক্তারের মুখে ছাই রঙের পাইপ, দেবীপ্রসাদ বর্মা চুরুটের ভক্ত—সর্বক্ষণই তাঁহার মুখে বৃহদায়তনের ধূম্রবর্ণ চুরুট সংলগ্ন দেখা যায়। অর্ধদগ্ধ চুরুটটি দাঁতে চাপিয়া দেবীপ্রসাদ বললেনঃ সবুরে মেওয়া ফলে—কথাটা যে বাজে নয়, এখন ত বুঝলে ডাক্তার? তুমি মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে? তোমার কথা মত যদি বিদ্যাপীঠের বীরমূর্তির কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া যেত, তাহলে আমাকে উনি বেকুব বানিয়ে ছাড়তেন।

মুখের পাইপে জোরে একটি টান দিয়া ধূম্রজাল ছড়াইয়া ডাক্তার উত্তর করিলেনঃ কুমার সাহেবকে বেকুব বানাবার মত হিম্মত এ মুলুকে কারুর আছে বলে ত আমাদের জানা নেই। বরং দেশশুদ্ধ সবাই জানে, আপনার চাচাজী সরদার-রাজা ভগবতী প্রসাদজীর মাথার উপর হাত বুলিয়ে ঐ ধড়িবাজ তাকত্‌ওয়ালা বাড়ী বাগিচা জমিন নগদ টাকা—কত কি বাগিয়ে নিয়ে বারো বছর ধরে নিজের মন মৌজে বিদ্যাপীঠকে অন্দরমহল বানিয়ে মেয়েদের তালিম দিচ্ছেন।

ডাক্তারের কথার প্রতিবাদে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেবীপ্রসাদ বলিলেনঃ অমন কথা বলবে না ডাক্তার, ওতে আমার চাচাজীর আত্মা বেজার হবেন। আপনি যাঁকে তাকত্‌ওয়ালা বলে হেনস্তা করছেন, জানেন—চাচাজীর চোখে তিনি কি ছিলেন? তিনি বলতেন—'মানুষের পেট থেকে মানুষ পয়দা হয়, কিছু শিক্ষার অভাবে সেই মানুষ বাঁদর হয়ে দাঁড়ায়, আবার গুরুর কৃপায় মানুষই

শিব-ভগবান হয়। সেই গুরুকে আমরা পেয়েছি আমাদের ভাগ্যের জোরে, আমি তাঁকে চিনিছি। আমাদের মেয়েরা ওঁর হাতে পড়লে যে ভগবতীর মত হবেন—আমি তা বিশ্বাস করি। সেইজন্যেই—তিনি যা যা চেয়েছেন, আমি তার কিছুই খুঁত রাখিনি।' তাহলেই বুঝুন, চাচাজীর সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলা আপনার উচিত হয় নি।

পাইপ টানিতে টানিতে ডাক্তার দেবীপ্রসাদের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন: আপনার চাচাজীকে আমি ত চোখে দেখি নাই কুমার সাহেব, আর—কি কথা যে সে-সময় তিনি বলেছিলেন, আমার শোনবার সৌভাগ্যও হয় নাই। লোকের মুখে মুখেই কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে, সেই সব ছড়ানো কথার মধ্যেও মিল নেই।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন: কিন্তু তুমি যে ভুলে যাচ্ছ ডাক্তার বারো বছর আগেকার সেই মিটিংএ আমিও যে হাজির ছিলাম, আর—তখন আমি নিতান্ত ছেলে মানুষও নই। কুড়ি একুশ বছরের যোয়ান, কলেজে পড়ি; সে দিন বীরমূর্তিজী যে-কথা বলেছিলেন, বারো বছর পরে তিনি এখনও যে কথা জানিয়েছেন, খাপছাড়া বলে ত মনে হচ্ছে না। আসল কথা তোমার দিলেই গলদ; চাচাজীর দেওয়া ঐ জায়গাটার ওপরে তোমার লোভ পড়েছিল, ওখানেই নার্সিং হোম খোলার জন্যে তুমি ক্ষেপে উঠেছিলে; সেটা সম্ভব হয়নি বলেই এখন তুমি এভাবে চুকলি কাটছ—এ কিন্তু তোমার অন্যায়!

দেবীপ্রসাদের মুখে এরূপ তিক্ত কথা শুনিয়াও, ডাক্তারের ধারালো মুখখানার কোন পরিবর্তন হইল না, নীরবে কয়েক মুহূর্ত নিবিষ্ট মনে পাইপের ধূম্রপানের পর পাইপটি আস্তে আস্তে পার্শ্বের সুশ্রী টিপয়টির উপর রক্ষিত রূপার অ্যাস্‌-ট্রের মধ্যে অবজ্ঞাভরে রাখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অদ্ভুত সে হাসি, তবে দেবীপ্রসাদজী সম্ভবতঃ সে হাসি চিনিতেন। সেইজন্যই বোধ হয় গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিলেন: এ হাসির মানে কি ডাক্তার? আমি কি ভুল বলেছি?

ডাক্তার বলিলেন : লোকে যখন হিসেব করে কথা বলে, মনের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকেই। আপনার কথা যখন সত্য, আমি ভুল বলি কি করে ? অমৃতসরে প্রাকটিস করতে এসে এমন এক মাহেন্দ্রক্ষণে কুমার সাহেবের সঙ্গে আমার চোখোচোখি হলো যে-পরস্পরের মধ্যে মুখ তুখানাই চেনা হলোনা—মনের ভিতরটা পর্যন্ত জানাশোনা হয়ে গেল। নৈলে সহরে তুচার ডজন ডাক্তার থাকতে এই অভাজনই বা কুমার সাহেবের একান্ত অন্তরঙ্গ হবে কেন ? তার নামও 'বি, এল, বি' হোয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরত না, তা ছাড়া তাকে প্রোভাইড্ করবার জন্যে ওদেশের অনুকরণে নূতন ধরণের এই নার্সিং হোমটি খুলে তার পিছনে দরাজ হাতে টাকাও ঢালতেন না। আমার মনের কথা—যাকে আমরা 'আইডিয়া' বলি—যেমন কিছুই লুকিয়ে রাখিনি, কুমার সাহেবও তেমনি তাঁর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্টকে বুজম্ ফ্রেণ্ড বানিয়ে নিজের সমস্ত দিলখানা খুলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তারপর ভগবতী বিদ্যাপীঠকে কব্জির মধ্যে আনবার জন্যে আমি উঠে পড়ে লেগেছিলুম কেন, কুমার সাহেব কি তার কারণ জানেন না ?

উৎফুল্ল মুখে দেবীপ্রসাদ বলিলেন : খুব জানি। কিন্তু তুমি যে শুরু থেকেই ভুলের পথে ছুটেছিলে ডাক্তার ! আমার চাচার্জী ঐ-বাড়ী বাগিচা বিদ্যাপীঠকে খয়রাৎ করে গেছেন, তাঁর ছেলে পার্বতীপ্রসাদও সেটা মেনে নিয়েছেন জেনেও তুমি আমাকে বার বার তাতাতে চেয়েছ—যাতে ওখান থেকে বিদ্যাপীঠকে উৎখাত করে আমাদের নার্সিং হোমের পত্তন করি।

অসহিষ্ণুভাবে ডাক্তার এখানে বলিয়া উঠিলেন : কিন্তু আপনিও আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, বিদ্যাপীঠের কাজ দেখে লোক যদি খুসি না হয়, তাহলে আপনি ওটা—

ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়ে দেবীপ্রাদ বলিলেন : চাচাজীর দানপত্রে একটা সর্ত এইভাবে লেখা আছে যে, বারো বছর পরেও

যদি বিদ্যাপীঠের কাজ আশানুরূপ না হয়, তাহলে ঐ বাড়ী—বাগিচার উপর অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হবে। কিন্তু বারো বছরের ঠিক মাথায় অধ্যাপক বীরমূর্তি যখন কৃতকার্য হয়েছেন বলে ফতোয়া দিয়েছেন, সেটা না দেখেই ও কথা তোলবার কোন সার্থকতা এখন আছে কি ?

ডাক্তার কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দেবীপ্রসাদ সে অবসর তাঁহাকে না দিয়াই পুনরায় বললেন: একটা কথা আমার মনে হয় ডাক্তার, ঐ বিদ্যাপীঠ থেকে মেয়েরা কৃতবিদ্য হয়ে বেরিয়ে আসে, অর্থাৎ অধ্যাপক বীরমূর্তির ভবিষ্যদ্বাণী ও লোকের আশা তারা সার্থক করে তোলে, এটা যেন আপনার অভিপ্রেত নয়। আপনি চাইছেন, দেশের মেয়েরা ও-সব উচ্চশিক্ষা আর শরীরচর্চার বদলে আপনার নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে শুধু এই বিদ্যাই শিক্ষা করে !

ডাক্তার এতক্ষণ পরিত্যক্ত পাইপটি তুলিয়া তাহার গহ্বরে নূতন মালমশলা ঠাসিতেছিলেন। ক্ষিপ্রহস্তে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে করিতে বলিলেন: ইয়া ! আপনি ঠিকই ধরেছেন। দেখুন আপনিও জানেন, অনেক দিনই আমাকে বিলাতে থাকতে হয়েছিল, আর —সেখানকার নার্সিং হোমের সঙ্গেই আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম। ওখানে অনেক আগে থেকেই মেয়েরা উচ্চশিক্ষা পেয়েছে ; সায়েন্স, ইণ্ডাষ্ট্রি, পলিটিক্স, ইকনমিক্স—এমন সাবজেক্ট নেই, মেয়েরা যেখানে না সেঁধিয়েছে। কিন্তু তার ফল কি হয়েছে শুনতে চান ? ওদেশের পুরুষরা এখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই সব শিক্ষিতা মেয়েদের জ্বালায়। যেহেতু, তারা সমিতি খুলে আন্দোলন করছে, পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার পাবার জন্যে নেচে বেড়াচ্ছে, গবরমেণ্টকে এই সব মেয়েরা অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ওদেশে ওরা যেন মস্ত আপদ হয়ে উঠেছে। আপনাদের এই অধ্যাপকটিও শুনছি ওদেশ ঘুরে এসেছেন ; এখন আমার এই আশঙ্কা, দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় তিনি

পাছে ওদেশের আদর্শে আমাদের সামনেও একটা 'সফ্রাজিষ্ট' দল খাড়া করে তোলেন !

মৃদু হাসিয়া দেবীপ্রসাদ বললেন : আমাদের দেশের মেয়েদের তেজ আর দাপাদাপির কথা কেতাবেই পড়ি—চোখে ত দেখিনি কোন দিন ! যদি পারেন তিনি, তাহলেও তাঁর পক্ষে সেটা মস্ত এক কৃতিত্বের কথাই হবে। এই তোমার কথাই বলি ডাক্তার, যেমন তুমি বলেছিলে—তেমনি করে সাজিয়ে গুছিয়ে এই নার্সিং হোম খোলা হয়েছে, কিন্তু কটা ভালো মেয়েকে এখানে ভেড়াতে পেরেছো বল ত ? সহরের কোন ভাল ঘর থেকে একটি মেয়েও এখানে নার্সিং শিখতে আসেনি, অথচ কত চেষ্টাই আমরা করেছি, কত প্রলোভন দেখিয়েছি ! মেয়েদের জন্যে বোর্ডিং খোলা হলো—খাঁ খাঁ করছে, বাইরে থেকে চেষ্টা-যত্ন করে যে-কটা মেয়েকে আনা গেছে, কিছুটা তারা য়্যাডভান্স হলেও, চেহারা দেখলে চোখ বুজতে ইচ্ছা করে। তুমিই বলো, কোন ভদ্রলোক এখানে সুস্থ হবার জন্যে নাম লেখাবেন ? কিন্তু অধ্যাপকজী বীরমূর্তির বিদ্যাপীঠে মেয়ে ধরে না—নূতন মেয়েদের নেওয়াই হচ্ছে না। এখন কথা হচ্ছে, যদি আমরা দেখি, অধ্যাপক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সত্যি সত্যিই কতকগুলো মেয়ে তৈরী করেছেন, আর তাদের চেহারাও চোখে লাগবার মত—তাহলে তখন সেই মেয়েগুলোকে এনে আমাদের নার্সিং হোমকে জাঁকিয়ে তোলা কি কঠিন হবে মনে কর ? আমরা ত তখন জোর করে বলতে পারব, এদের যখন ভয় ভেঙেছে, ভালো রকম শিক্ষা পেয়েছে, স্বাস্থ্য ভালো, সাহস আছে, তখন আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরী নার্সিং হোমে তাদের যোগ দেওয়া উচিত। সে সময় অবস্থা বুঝে না হয় উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই যাবে—দরাজ হাতে টাকা ফেললে কি না করা যায় বলো ?

এতক্ষণ পরে কুমার সাহেবের মনের আসল কথাটি তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইতেই অন্তরের পরিপূর্ণ আনন্দে ডাক্তারের শুষ্ক মুখখানিও

বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কৌচ ছাড়িয়া উঠিয়া কুমার সাহেবের কৌচের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাঁহার হাতখানি ধরিয়া ঝাঁকি দিতে দিতে বলিলেন ঃ সাবাস কুমার সাহেব! সত্যিই আপনি আমাকে চমকে দিলেন। আমি কিন্তু এদিক দিয়ে ত কথাটা ভাবিনি, অথচ আপনি খাসা একটা প্ল্যান মাথার মধ্যে ছকে রেখেছেন—আমাকে পর্যন্ত জানতেও দেননি।

কুমার সাহেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া ডাক্তারকে নিবিড়ভাবে কাছে টানিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন ঃ আপনারা হচ্ছেন বিদ্বান ব্যক্তি, কর্মী পুরুষ, বড় বড় পরিকল্পনা নিয়ে হুল্লোড় করা আপনাদের অভ্যাস। আমরা মূর্খ মানুষ, বিদ্যার তেমন ধার ধারি না, তবে ঘটে কিছু বুদ্ধি রাখি; আর—আসলে সেটা শুদ্ধি না হ'লেও ঠিক মত সময় বুঝে এমন ভাবে চালনা করি যে, দিব্যি কাজে লেগে যায়—বুঝলেন? একটা প্রবাদ আছে, সেটা নিশ্চয়ই জানেন—

ধনবান কেনে বই—জ্ঞানবান পড়ে,
বোকারাম গাড়ী করে—বুদ্ধিমান চড়ে।

ছড়াটি বলিয়াই কুমার সাহেব খুব জোরে হাসিয়া উঠিলেন; ডাক্তারও সহর্ষে সে হাসিতে যোগ দিলেন।

ইঁহাদের এই সংলাপ হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পূর্বোক্ত ভগবতী বিদ্যাপীঠের প্রতি ডাক্তার বিহারীলাল ওরফে বি, এল, বি শ্রদ্ধাশীল ত নহেনই, বরং তাঁহার অন্তরে বিরাগের অন্ত নাই। কুমার সাহেবের মুখের কথায় বিদ্যাপীঠের উপর সহানুভূতির আভাস থাকিলেও, তাহা হইতে অন্তর্নিহিত আসল ভাবটুকুর সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে সংলাপের শেষের দিকে কথার পীঠে যে কথাগুলি বলিয়া ডাক্তারকে তিনি উৎসাহিত করিয়া দিলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্বের প্রচ্ছন্ন ভাব কিছুটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিল মাত্র। তবে ইঁহাদের দীর্ঘ সংলাপ হইতে যে নির্গলিতার্থ উপলব্ধি করিতে পারা গেল, তাহার মর্ম হইতেছে—শিক্ষিতা সুদর্শনা রূপসী তরুণীদের

অধ্যাপক বীরমূর্তির ঈপ্সিত ভগবতী বিদ্যাপীঠ পরিকল্পনার প্রস্তাবে প্রীত হইয়া সরদার ভগবতীপ্রসাদ যে সময় তাঁহার হস্তে অমৃতসরের বাসভবন সহ একটা তালুকের আয় পর্যন্ত সমর্পণ করেন, তাহার কিছু পরেই তিনি সরকার কর্তৃক রাজা উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হন। স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহার এই বিপুল দানে মুগ্ধ হইয়া পাঞ্জাবের তৎকালীন সদাশয় গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ সুপারিশ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। বস্তুত উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তক ইংরেজ জাতির পক্ষে শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ব্যক্তির প্রতি উৎসাহদান সম্পর্কে এরূপ মহানুভবতা ও উদারতা স্বাভাবিক। ভগবতীপ্রসাদ কিন্তু বৃটিশ সরকারের এই বদান্যতায় অন্যান্য উপাধিলুব্ধের মত অত্যুল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠেন নাই; বরং তিনি বন্ধুবর্গের নিকট আক্ষেপ করিয়াছিলেন—'সরকার ভুল বুঝে আমাকে এত বড় একটা খেতাব খয়রাৎ করে ফেলেছেন। কিন্তু অধ্যাপক বীরমূর্তির বিদ্যাপীঠ থেকে প্রথম দফায় যে-সব মেয়ে বেরিয়ে এসে তাদের শিক্ষার ধারা বাতলাতে থাকবে, তখন সরকারকে আফশোষ করতে হবে—অপাত্রে এর অপব্যবহার দেখে!' বিচক্ষণ সরদারজী এই জন্য তাঁহার উপাধি লইয়া বাড়াবাড়ি করেন নাই, এবং তাঁহার কৃতবিদ্য পুত্র পার্বতীপ্রসাদও বরাবরই পিতাজীর মতানুবর্তী রূপে পিতার মতই নীরব দেশসেবক। তিনিও এই উপাধির জন্য কিছুমাত্র উৎসাহিত হন নাই। কিন্তু সরদারজীর ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীপ্রসাদ শৈশব হইতেই আড়ম্বরপ্রিয়, তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিনি চাচাজীর উপাধিসূত্রে নিজের নামের পূর্বে 'কুমার' শব্দটি সংযুক্ত করিয়া গর্ব বোধ করেন। সরদারজী তাঁহার বিপুল জমিদারী ও ধনসম্পত্তি পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া দেন। পিতার মৃত্যুর পর পার্বতীপ্রসাদ জলন্ধরে থাকিয়া জমিদারীর উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। দেবীপ্রসাদ জলন্ধর প্রাসাদের হিস্যা ত্যাগ করিয়া অমৃতসরের অন্যতম পৈতৃক আবাসভবনে বাস করতে থাকেন।

ভগবতীপ্রসাদের ইচ্ছা ছিল, এখানকার বিস্তীর্ণ ভবনে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবেন। দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে, বিশাল বাড়ীর একাংশ তিনি উক্ত সদনুষ্ঠানেই ন্যস্ত করিয়া চাচাজীর উদ্দেশ্য সাধনে অবহিত হইবেন।

ভগবতীপ্রসাদ ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া দেবীপ্রসাদের হস্তে গোপনে প্রচুর টাকাও প্রদান করেন। সরদারজীর মৃত্যুর পরেই বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার বিহারীলালের সহিত দেবীপ্রসাদের আলাপ হয়। সেই আলাপ কিরূপে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে, এ দিনের সংলাপ সুত্রেই তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে।

ডাক্তার বিহারীলালের মতে এদেশের মেডিকেল কলেজগুলি অকেজো। সেইজন্য তাঁহাকে ওদেশেই ডাক্তারী বিদ্যায় হাতে খড়ি দিয়া বহু শ্রম ও সাধনায় এতগুলি উপাধি লাভ করিতে হইয়াছে। এই ডাক্তারটির এম, ডি উপাধির সংক্ষিপ্ত অক্ষর দুইটির পরও এফ, আর, সি, এস প্রভৃতি কতকগুলি অক্ষরের প্রাচুর্য দেখা যায়। ইনি নাকি এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরও বছর কয়েক ওদেশে থাকিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছেন এবং এই প্রদেশেই চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক আছেন শুনিয়া দেবাপ্রসাদ তাঁহাকে লুফিয়া লন। তিনি বলেন—'আমার চাচাজীর দুটি সঙ্কল্প ছিল। এদেশের মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ভগবতী তৈরী করা, আর—দেশের লোকের জন্যে একটা হাসপাতাল খুলে দেওয়া। একটি ভার নিয়েছেন অধ্যাপক বীরমূর্তি, অপরটির ভার দিয়ে গেছেন আমার উপর। আমি ত ভেবেই অস্থির—কি ভাবে কাজ আরম্ভ করি? এমনি সময় আপনাকে পেয়ে গেছি, আর ছাড়ছি নে।'

ডাক্তার ইতিমধ্যেই অধ্যাপক বীরমূর্তির ভগবতী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা ও সরদার ভগবতীপ্রসাদের বিরাট দানের কথা শুনিয়াছিলেন। দেবীপ্রসাদের কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি কি ভাবে হাসপাতাল খুলতে চান?' দেবীপ্রসাদ উত্তরে বলেন—'দেখুন,

সত্য কথা তবে আপনাকে বলি, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটা মোহ আছে ; পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংস্পর্শ আমি বেশী ভালবাসি। এমন একটা হাসপাতাল করা যায় না—যেখানে মেয়েদেরই প্রাচুর্ভাব থাকে ? বীরমুর্তির ঐ বিদ্যাপীঠের মতন এখানেও মেয়েদের নিয়ে একটা কোন রকম শিক্ষাপীঠ তৈরী করা যায় না—ধরুন, মেয়েদের চিকিৎসা বিদ্যা শেখানো হবে, শিক্ষার সঙ্গে তারা রোগীদেরও দেখবে, সেবা শুশ্রূষা করবে—এমন কিছু হলে চাচাজীর সঙ্কল্পটা বজায় থাকে, আমিও সময় কাটাবার মত একটা আনন্দময় পরিবেশ পাই, এই আর কি !'

দেবীপ্রসাদের কথার মধ্যে তাঁহার মুখ ও চোখের ভঙ্গির উপর ডাক্তারের অন্তরস্পর্শী দৃষ্টি উজ্জ্বল আলোক-রশ্মির মত নিবদ্ধ থাকায় তাহার আভায় সমস্ত অন্তরটি উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারও পুলকিত হইয়া উঠেন এবং এরূপ চুর্বল ও কোমল মনোবৃত্তিশীল ব্যক্তিকে কব্জির মধ্যে আনিয়া কাজ বাগানো যে সহজ হইবে, এই ধারণায় তিনি দেবীপ্রসাদের কল্পিত কামনার বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে থাকেন। ডাক্তারকেও নিজের মতানুবর্তী দেখিয়া দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। ডাক্তার বিলাতী নার্সিং হোমের অনুকরণে তাহার কাঠামোর উপর দেবীপ্রসাদের রুচি অনুযায়ী নিজের পরিকল্পনায় এমন এক প্রতিষ্ঠান গঠনের আভাস দিলেন—তরুণীরাই যাহার প্রাণস্বরূপিণী। স্বর্গত রাজা ভগবতীপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার দেবীপ্রসাদ হইবেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট, প্রতীচ্যে শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এম, ডি, এফ, আর, সি, এস প্রভৃতি চুর্লভ উপাধিধারী ডাক্তার বি, এল, বি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করিবেন এবং নারীদের অভিভাবিকারূপে মাথার উপরে থাকিবেন চিকিৎসা ও ধাত্রী বিদ্যায় পটিয়সী এক অভিজ্ঞা মহিলা। কেবলমাত্র নারীদিগকে তিনি স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগের চিকিৎসা ও রোগীর সেবা শুশ্রূষা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন। ইহা ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিলাতের

নার্সিং হোমের আদর্শে তুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে—বাহিরের পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ; ভগ্ন স্বাস্থ্য তুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী-দিগের এখানে থাকা ও চিকিৎসা চলিবে। ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যে তাহারা উপাদানও হইবে। উভয় বিভাগেই নির্দিষ্ট সংখ্যক রোগ-শয্যা থাকিবে।

প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানপত্র দেখিয়া দেবীপ্রসাদ এতই উৎফুল্ল হইয়া উঠেন যে, তৎক্ষণাৎ তাহা মঞ্জুর করিয়া কথা দিয়া বলেন—যত টাকাই লাগুক, আমি এতে রাজি। শুধু একটি প্রশ্ন করব, সে রকম মহিলা আপনার সন্ধানে আছেন কি—যিনি চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যায় পটিয়সী ?

গম্ভীর মুখে ডাক্তারও জবাব দেন—আছেন—তিনি আমার স্ত্রী।

দেবীপ্রসাদের মুখমণ্ডল বিপুল বিস্ময়ে বিলুলিত হইয়া উঠে। তিনি ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টিতে ডাক্তারের স্মিত মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া মুখে ও চোখে উল্লাসের আভা ফুটাইয়া পরক্ষণেই বলেন—তোমার স্ত্রা ? ভারি আশ্চর্য তো ; আরে, তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছে, এত বড় একটা পরিকল্পনা চলেছে তোমাকেই উপলক্ষ্য করে, অথচ তোমার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছুই আমি জানি না—একেবারে অন্ধকারে পড়ে আছি ! তুমিও বলনি যে, তোমার স্ত্রী আছেন, এবং তিনি সাধারণ নারী নন ?

মৃতু হাসিয়া ডাক্তার বলেন—আপনিও তো সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি কুমার সাহেব ! বিবাহ আপনি করবেন না, অবিবাহিত অবস্থায় আপনার চাচাজীর একটা বিরাট কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন—একথা সবাই জানে। কিন্তু তাই বলে আপনি যদি মনে করে থাকেন, যারা আপনার সংস্পর্শে আসবেন, তারা সকলেই আপনার মত ব্রহ্মচারী—তাহলে তাদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা যে ভুল হয়েছে, এ কথা আমরা যদি বলি, সেটা অবশ্যই অন্যায় হবে না।

অপরাধীর মত বিব্রত ভাবে দেবীপ্রসাদ বলেন—না, না, অন্যায় আমারই হয়েছে ডাক্তার। এই দেখ না হে, তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে, অথচ শুধু তোমাকে নিয়েই আমি ব্যস্ত; কিন্তু তোমার পিছনে যে পরিজনদের থাকা সম্ভব, সে কথা আমার মনেও হয়নি, জিজ্ঞাসাও করিনি। যাক, কথার পীঠে কথাটা যখন জানা গেছে, এখন তোমার ঘর-গৃহস্থালী ও পরিজন সম্বন্ধে সব কথা আমাকে বলা চাই।

ডাক্তার তখন বলেন—এ ব্যাপারে আমার বলবার মত বিশেষ কিছু নেই। আগেই তো আপনাকে বলেছি, আমার শিক্ষা দীক্ষা সব কিছুই ওদেশে। ডাক্তারী যখন পড়ি, একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব মাখামাখি হয়। তিনিও একই কলেজে আমার সঙ্গে ডাক্তারী পড়তেন। তাঁর এক আত্মীয় ডাক্তার ঐ কলেজে চাকরী করতেন। তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হলে মেয়েটি অসহায় হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় আমি তাঁকে বিবাহ করতে বাধ্য হই। আমরা তখন স্থির করি যে, ইণ্ডিয়ায় ফিরে এসে তুজনেই প্রাক্‌টিস করব। সেজন্যে মেয়েদের চিকিৎসা সম্বন্ধে যা কিছু হাতে কলমে শিখবার দরকার, সেই সব শিক্ষায় তাঁকে পারদর্শিনী করবার জন্যে আরও বছর তুই ওদেশে কাটিয়ে আমরা আবার ইণ্ডিয়ায় ফিরে আসি। ইচ্ছা ছিল, করাচীতেই প্রাকটিস্‌ করব ; কিন্তু ও জায়গাটা আমার স্ত্রীর পছন্দ হলোনা ; তাঁর ইচ্ছা অমৃতসরেই চেম্বার খুলে বসি। সে সম্বন্ধে চেষ্টা যত্ন চলেছে, এমন সময় আপনার সঙ্গে আলাপ, তারপর আপনার চাচাজীর হাসপাতালই বলুন, আর আপনার নার্সিং হোমই বলুন, তাদের সম্বন্ধে প্ল্যান শুধু যে আমাদের তুজনের মগজে ঘুরছে তা নয়—আমার স্ত্রীও চুপ করে বসে নেই, নানারকম আইডিয়া নিয়ে তিনিও মাথা ঘামাচ্ছেন। এখন প্ল্যানটা যখন আপনি মঞ্জুর করলেন, এখন ত আর তাঁকে আড়ালে রাখা যায় না, বিশেষ করে

মেয়েদের নিয়ে যখন কারবার এবং তাদের ওপরে একজন মেয়ে ওপরওয়ালা যখন চাইই।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কুমার উত্তর করেন—নিশ্চয়ই…ওঁর সম্বন্ধে তোমার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমি যেন অভিভূত হয়ে পড়ছি। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ডাক্তার, সংক্ষেপে তুমি ওঁর সম্বন্ধে সবই বলেছ, কিন্তু কোন্ দেশের মেয়ে উনি, সেইটিই—

খপ্ করিয়া ডাক্তার কুমার সাহেবের মুখের উপরেই বলিয়া উঠেন—ও! সেটি ধরতে পারেননি বুঝি? কিন্তু আমার কথায় খুঁত নেই—এদেশে ফেরবার কথা যখন বলেছি, বুঝতে হবে এদেশেরই মেয়ে উনি।

তেমনিই উল্লাসের সুরে কুমার সাহেব বলেন—বা! তাহলে ত আর কোন কথাই নেই! ওদেশের মেয়ে হলে বরং—

কুমার সাহেবের কথায় বাধা দিয়া ডাক্তার বলেন—সেদিক দিয়ে কোন আশঙ্কা আপনার নেই কুমার সাহেব! মেয়েদের নিয়ে যখন হোম খুলতে চলেছি, আদর্শভ্রষ্ট হওয়া চলবে না। আমাদের দেশের মেয়েরা বিদেশিনীকে সহ্য করবার মত শিক্ষা এখনও পায়নি কিনা, তাহলেই গোল বাধাবে। তবে কুমার সাহেব শুনে সুখী হবেন, আমার গৃহিণী খাস কলকাতার মেয়ে। ওঁদের পৈতৃক বংশ খুব বিখ্যাত হলেও ভারি গোঁড়া; সেই গোঁড়ামী ভেঙে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠাতেই ওঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়। উনি কিন্তু বেপরোয়া হয়ে সেই হিতৈষী আত্মীয়টির সঙ্গে একেবারে দেশ ভূমি ছেড়ে বিদেশে পাড়ী দেন। এখন দেশে ফিরলেও, ওঁর ঝোঁক হচ্ছে—আত্মীয়দের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবেন না, কাউকে জানাবেন না যে উনি দেশে ফিরেছেন।

কুমার সাহেব বলেন—খুব ভালো কথা। কিন্তু এখানে এসে অবধি ওঁকে যে পাবলিক হোটেলের পরিবেশে বাস করতে হচ্ছে একথা মনে উঠলে আমার যে অস্বস্তির অন্ত থাকে না ডাক্তার।

ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটু ক্ষীণ রেখা ফুটাইয়া ডাক্তার বলেন—তার কারণ হচ্ছে মেয়েদের সম্বন্ধে কুমার সাহেব বরাবরই অতিরিক্ত মাত্রায় অনুগ্রহপরায়ণ, সেই জন্যই ওদের ব্যাপারে পাণ থেকে চুণটুকু খসলেই এভাবে অস্বস্তি বোধ করেন। বেশত, এখন নিজেই উদ্যোগী হয়ে ওঁর সম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি রেখে বাসস্থানের একটা ব্যবস্থা করে ফেললেই পারেন।

কুমার সাহেবও ঝোঁকের মাথায় উগ্র উৎসাহের তাড়নায় সেই ব্যবস্থাটি তৎক্ষণাৎ পাকাপাকি করিয়া ফেলেন। তখনই স্থির হয় যে, প্রাসাদতুল্য সরদার-ভবনের বাহিরের দিকে যে বিশিষ্ট অংশে কয়েকখানি সুসজ্জিত ঘর ও চার পাঁচজন খিতমতদার লইয়া কুমার সাহেব নিশ্চিন্ত আরামে বসবাস করিতেছেন, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ভিতর মহলের সমগ্র অংশ তাঁহাদের পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানটির জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। বহির্মহলে প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়, ডাক্তার বি. এল. বি'র খাস কামরা, বাহিরের অভ্যাগতদের জন্য সাজানো ড্রয়িং রুম প্রভৃতির কোনটির অভাব নাই—যেন এই প্রতিষ্ঠানটির জন্যই এই বিশাল প্রাসাদ পূর্ব হইতেই তৈয়ারী হইয়া আছে। ভিতরে বিস্তীর্ণ অঙ্গন, উপর ও নিম্নতলায় আলো বাতাসযুক্ত অসংখ্য কক্ষ, বাড়ীর পিছনে ও পুরোভাগে সুপরিচ্ছন্ন মনোরম উদ্যান ও লন বা মুক্ত প্রাঙ্গন। বহির্মহলের একাংশে কুমার সাহেবের ব্লকটি যেমন এই অট্টালিকার অন্তর্গত হইয়াও স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত, অন্যদিকে অপর একটি ব্লকও অবিকল এই ভাবে নির্মিত হইয়া বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যই নির্দিষ্ট হইয়া আছে। ভিতরের দিকে সংযোগদ্বার বন্ধ করিলেই সেটি স্বতন্ত্র ভবনে পরিণত হয়। কিন্তু সরদার সাহেবের পরলোকগমনের পর অতিথি অভ্যাগতদের আসা-যাওয়া বা থাকিবার পাট উঠিয়া গিয়াছে। বর্তমান মালিক একান্ত অন্তরঙ্গ-স্থানীয় কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধু ব্যতীত বাহিরের সহিত মিশিতে বা কোনও প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতে অভ্যস্ত নহেন। কাজেই,

মহলটি অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া কুমার সাহেব বাড়ীখানির বিভিন্ন অংশ দেখাইবার সময় উহার উপর লক্ষ্য পড়িবামাত্র নিজেই মহলটির তত্ত্বাবধায়ককে এই ভাবে হুকুম দিলেন যে, লোকজন লাগাইয়া ঘরগুলি যেন তাড়াতাড়ি ধুইয়া মুছিয়া সাফ করা হয়; ডাক্তার সাহেব তাঁহার জানানাদের লইয়া এই মহল্লায় থাকিবেন। কোন দিক দিয়া তিনি যেন কোনও প্রকার অসুবিধায় না পড়েন।

অতঃপর ডাক্তারকে লইয়া নিজের মহলে ফিরিয়া আসিয়া কুমার সাহেব জিজ্ঞাসা করেন—কেমন, বাসা ডাক্তারের পছন্দ হয়েছে ত? কিম্বা লেডী ডাক্তারকে আগে ব্লকটা দেখিয়ে তারপর—

ব্লকটি দেখিয়া এবং সে সম্বন্ধে কুমার সাহেবের হুকুম শুনিয়া ডাক্তার ত আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন তাঁহার মুখে পুনরায় এই প্রস্তাব শুনিয়া গদ গদ স্বরে বলিয়া উঠেন—এভাবে কথা বলে আমাদের আর লজ্জা দেবেন না কুমার সাহেব! শুনেছেন ত, এসে অবধি হোটেলের একখানা ঘর নিয়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছি। আপনি সেখান থেকে একবারে স্বর্গে এনে তোলবার ব্যবস্থা করলেন! আমি ত কল্পনাও করতে পারিনি যে, কুমার সাহেবের প্যালেসে—

ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়ে কুমার সাহেব বলেন—থাক, আমাকে আর স্বর্গে তোলবার প্রয়োজন হবে না। তাহলে জানা গেল যে, ঐ ব্লক ডাক্তারের পছন্দ হয়েছে, সুতরাং এরপর লেডী ডাক্তারেরও অপছন্দ হবে না। এখন হোটেলের বাসা তুলে যত তাড়াতাড়ি পারো, এখানে চলে এসো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এখানকার কাজ ওরা শেষ করে ফেলবে। তারপর, যে সব আসবাব-পত্র এখানে আছে, তার ওপর যা যা দরকার পড়বে সবই এসে যাবে।

ডাক্তার এ প্রস্তাবেও মৃদুভাবে আপত্তি জানান—আবার কি

আসবাবপত্র নতুন করে আনবেন, সবইত রয়েছে দেখলাম!

কুমার সাহেব বলেন—আর সব থাকলেও ডাক্তার-দম্পতির ব্যবহার-যোগ্য জিনিস পত্রের অভাব আছে বৈকি! কোনও ডাক্তার ত আর এর আগে এখানে এসে বসবাস করেন নি!

স্থির হইয়া যায় যে, হোটেলের দেনা-পত্র সমস্তই পরিশোধ করিয়া পরদিনই সায়াহ্নে ডাক্তার পত্নীকে লইয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে আসিবেন। বিবেচক কুমার সাহেব ডাক্তারের বাসার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, ইতিমধ্যেই ডাক্তার-দম্পতির সচ্ছলভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহের বন্দোবস্তও হইয়া যায় এবং স্থির হয় যে, উপস্থিত স্বামি-স্ত্রী মাসিক পাঁচশত টাকা হিসাবে নির্দিষ্ট বৃত্তি পাইবেন এবং এখানকার কার্যভার বজায় রাখিয়া বাহিরের চিকিৎসাব্যাপারেও ব্রতী থাকিতে পারিবেন। এরূপ সম্ভাবনা ডাক্তারের পক্ষে অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত; তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগে বলিয়া উঠেন যে, বাহিরের রোগীদের দিকে তাঁহাদের কোন আকর্ষণই নাই, নার্সিং হোমটিকে জাঁকাইয়া তুলিয়া সেই সঙ্গে কুমার সাহেবকেও খুসি করাই তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য হইবে।

কথাগুলি বলিবার সময় আনন্দ বিহ্বল চিত্তকে সবলে চাপিয়া রাখিয়া চিত্ত দমনে স্বতঃসিদ্ধ ডাক্তার কুমার সাহেবের সম্মুখে নত হইয়া যেরূপ ভঙ্গিতে তাঁহার বলিষ্ঠ হাতখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরেন, তাহা আনুগত্যেরই পূর্ণ নিদর্শন।

সহরের মিলিটারী লাইনে পাঞ্জাব হোটেলটি এই সময়ে শোভা, সমৃদ্ধি ও আভিজাত্যের দিক দিয়া বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এবং নবাগত ইউরোপীয় নরনারী ও অন্যান্য প্রদেশের প্রগতিবাদী সম্প্রদায় ষ্টেশনে নামিয়া সরাসরি এইখানে উঠিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা পান। স্থানটির পরিবেশ রমণীয়, বিধি ব্যবস্থাও প্রশংসনীয়। ডাক্তার দম্পতি প্রশংসা শুনিয়াই এই হোটেলে উঠিয়াছিলেন। নিম্নতলের নিরিবিলি

অংশে ছোট একখানি ঘর খালি পাইয়া এবং তাহার হার অপেক্ষাকৃত সুলভ দেখিয়া তাঁহারা সেইখানেই অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ঘরের ভাড়ার হার কিছুটা কম হইলেও, খানাপিনার ব্যয় মিটাইতে ডাক্তারের পুঁজি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। পক্ষান্তরে আয় বা উপার্জনের দিকটায় বড় আয়তনের যে শূন্যটি গোড়া হইতে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার আর পরিবর্তন ঘটে নাই বা তাহার আগে কোনও অঙ্কসংখ্যা সংযুক্ত হয় নাই। এরূপ জটিল অবস্থায় এই দম্পতির হোটেলের পরিবেশে জীবন-যাত্রা যখন দুর্বহ হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে যেন ডাক্তারের ভাগ্যদেবতার আকস্মিক নির্দেশেই কুমার সাহেবের সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাঁহার সংযোগে ঘটে এবং অবিলম্বে তাহা রীতিমত ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয় হইয়া উঠে।

কুমার সাহেবের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে এই ডাক্তারটিকে অমৃতসরের কোনও ব্যক্তির সহিত মিশিতে দেখা যায় নাই এবং পৃথিবীতে এই কুনো মানুষটির কোন পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন আছে কিনা, তাহারও কোন নিদর্শন নাই। পাঞ্জাব হোটেলে উঠিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তরফ হইতে বিভিন্ন সংবাদপত্র সমূহে এইরূপ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়ঃ

ইউরোপ ও আমেরিকা-প্রবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক এবং ওদেশের বিভিন্ন মেডিকেল প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ডাঃ বি, এল, বি, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস, পি-আর-এল-এস-ও ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন পূর্বক পাঞ্জাব প্রদেশের কোন প্রসিদ্ধ সহরে নিজস্ব চেম্বার খুলিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায়ে ব্রতী হইবেন। সংশ্লিষ্ট মহল, পাঞ্জাব-হোটেলে ডাক্তার সাহেবের সহিত সংযোগ স্থাপন করুন।

অত্যন্ত শুভক্ষণেই ডাক্তার এই বিজ্ঞাপনটি বাহির করিয়াছিলেন। বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেবীপ্রসাদই সর্বপ্রথম তাঁহার সহিত ফোনে আলাপ করেন এবং তৎক্ষণাৎ গাড়ী পাঠাইয়া

ডাক্তারকে হোটেল হইতে তাঁহার আলয়ে লইয়া আসেন। সদ্য বিদেশ-প্রত্যাগত দীর্ঘ উপাধিধারী এই ডাক্তারটির প্রতি তাঁহার চিত্ত সহসা আবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং সরদার-ভবনে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে স্বর্গত সরদার সাহেবের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি তাঁহাকে সক্রিয় করিয়া তোলে। ফলে, প্রথম আলাপেই এই কথা-কৌশলী ডাক্তারটি কুমার সাহেবকে মাত করিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠতম অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন। ইহার পরবর্তী ঘটনা—সরদার ভবনের একটি বিশিষ্ট অংশে নার্সিং হোম সম্পর্কে সস্ত্রীক ডাক্তারের বসবাসের কথা আগেই বলা হইয়াছে।

এই ডাক্তারটিকে বরাবরই নিজের দেশভূমি বা জন্মস্থান সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া তাঁহার শিক্ষাস্থান ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতি-সম্পন্ন প্রধান প্রধান নগরীর গৌরব স্বরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বপক্ষে সুখ্যাতির ঢাক পিটিতে দেখা গিয়াছে। কথা-প্রসঙ্গে দেশের কথা উঠিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ বিদেশের এমন কোন প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলেন যে, প্রাসঙ্গিক ঘটনারূপে তাঁহার কথা শ্রোতাদের চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। নিজের দিক দিয়া ডাক্তারকে প্রত্যেক কথাটি হিসাব করিয়া বলিতে শোনা যায়; অন্যের কথার আঘাতে ডাক্তারের মুখের কথা বন্ধ হইবে এবং তিনি অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জাবোধ করিবেন, সেরূপ পাত্রই তিনি নহেন।

ডাক্তার অবশ্য বাঙালী বলিয়াই আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার বংশ পরিচয় বা জন্মস্থান সম্বন্ধে কোন তথ্যই কাহাকেও বলেন নাই এবং এত অল্প লোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় যে, কেহই সে সব তথ্য জানিবার জন্য আগ্রহান্বিতও নহেন। আত্ম-পরিচয় সম্পর্কে তিনি যাহা জানাইয়াছেন, তাহাতে এইমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার অধিকাংশই ওদেশ হইতে অর্জিত হইয়াছে—তজ্জন্য তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার নামকরা বিশ্ব-

বিদ্যালয়গুলির নিকট নানাভাবে ঋণী। সেই জন্যই তিনি ওদেশের বেশভূষা ও আদবকায়দার অনুসরণে একান্তই অভ্যস্ত এবং প্রকৃতিদত্ত আকৃতিটিকে ফিটফাট পরিচ্ছদে ও সযত্ন প্রসাধন-পারিপাট্যে যতখানি সম্ভব প্রিয়দর্শন বা চক্ষুচমৎকারী করিয়া তুলিতে প্রত্যহ অনেকখানি সময়ের অপব্যয় করিয়া থাকেন। ডাক্তারের গৃহিনী দক্ষিণা দেবী কিন্তু এজন্য প্রায়ই প্রসাধন-ব্যস্ত স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপোক্তি করেন—'বিধাতাপুরুষ তাঁর হাতে যা গড়েছেন, তুমি নিজের হাতে তার ওপর হাজার পালিস করলেও তা বদলাবে না; মাঝে থেকে মিছি, মিছি স্নো-পাউডার ঘষে আর সময় নষ্ট করে কি লাভ বল?'

এইখানেই গৃহিনীর সহিত ডাক্তারের বনিবনাও হইত না—প্রায়ই কথা কাটাকাটি চলিত। কারণ, ডাক্তারের চেহারার তুলনায় ডাক্তার গৃহিনীর চেহারা সব দিক দিয়াই এত বেশী নিরেস যে, উভয়ে পাশাপাশি দাঁড়াইলে প্রথম দর্শনেই চক্ষুপল্লব স্থির ও আড়ষ্ট হইয়া পড়ে! মনে প্রশ্ন জাগে—বিধাতা পুরুষ কি নির্জনে বসিয়া এই মহিলাটির আকৃতির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন? প্রথমতঃ, ইহার সমগ্র দেহের ব্যাস ডাক্তার বি, এল, বি'র দেহের অনুপাতে প্রায় আড়াই গুণ অধিক। তারপর, বয়ঃক্রমের দিক দিয়াও এক নজরেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি ডাক্তারের সমবয়স্কা ত নহেনই, বরং তাঁহার অপেক্ষা দুই তিন বৎসর বড়ই হইবেন। দীর্ঘকাল ওদেশে কাটাইয়া আসিলেও স্বামি-স্ত্রীর গায়ের রঙ সুগৌর বা ধবধবে সাদা নয়। নিগ্রোরাও আমেরিকার অধিবাসী—সেখানকার জল বায়ুর পরিপূর্ণ সুযোগ লইতে অভ্যস্ত, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের গায়ের চামড়াও সাদা হয় না। ডাক্তার অবশ্য গায়ের রঙটি বদলাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও সে চেষ্টার নিবৃত্তি হয় নাই; কিন্তু ডাক্তার-পত্নী এ ব্যাপারে হাল ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ডাক্তারকে অতিমাত্রায় প্রসাধন-ব্যস্ত দেখিয়া তিনি উপহাস করিয়া

বলেন—দেখ, ছেলেবেলায় একখানা গান শুনেছিলুম, তার একটা লাইন মনে আছে। একজন কালো কুৎসিৎ লোক ফরসা হবার জন্যে যখন তখন গায়ে সাজিমাটি ঘসত বলে সে গ্রামের এক পাগল কবি তাকে লক্ষ্য করে গান বেধেছিল ঃ

যে আঁচড় টেনেছে সাঁইজী, তার বাড়া রূপ ফুটবে না।

ঘসা মাজা করিস্ যতই—কয়লা সাদা হবে না।

বিধাতাও যে আমাদের গায়ে কয়লার ছোপ দিয়ে পাঠিয়েছেন, ও ছোপ উঠবে না।

পত্নীর পরিহাস শুনিয়া ডাক্তার মনে মনে জ্বলিয়া উঠিলেও চুপ করিয়া থাকিতেন, কোন জবাব দিতেন না। নিজের অপেক্ষা পত্নীর চেহারার জন্য তিনি বিমর্ষ থাকেন? যদিও আদর করিয়া পত্নীকে 'দেবী' বলিয়া সম্ভাষণ করেন, কিন্তু দেবী যখন অতিরিক্ত গোলগাল সৌষ্ঠবহীন মাংসল মুখখানার ভিতর দিয়া বড় বড় দন্তপাটি নির্গত করিয়া হাসিয়া উঠিতেন, ডাক্তার তখন মনে মনে শিহরিয়া নিজেকে সংযত করিতেন। কারণ, পত্নীর এরূপ কদর্য আকৃতির মধ্যে দেবীত্বের কোনও নিদর্শনই তাঁহার চক্ষুকে আকৃষ্ট করিত না। বস্তুতপক্ষে ডাক্তার-গৃহিনী দক্ষিণা দেবীর নামটি শুনিবা মাত্র তাঁহার প্রতি যে পরিমাণে শ্রদ্ধাভাবেব সঞ্চার হয়, চোখের সামনে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেই সে শ্রদ্ধা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়া মনের মধ্যে যেন একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে বিচিত্র মুখখানির তুলনায় তাঁহার চক্ষু দুইটি সেই অনুপাতে ক্ষুদ্র হইলেও, তাঁহার দৃষ্টি এরূপ স্থির ও দৃঢ় যে, মনে হয়, সমস্ত মুখখানাকেই, তাহা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, অথচ তাঁহার মুখের হাসিটি যেন মুখের ভিতরেই পুরিয়া রাখিয়াছেন। পরিচিত অপরিচিতের সংস্পর্শে আসিবা মাত্র সে হাসি সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে এবং হাসির কোনও কথা বা কারণ না থাকিলেও তাঁহার মুখের হাসি সরবে ফুটিয়া বাহির হইবেই। ডাক্তার গৃহিনীর এই অহেতুকী হাসিটি ক্রমশঃ যেন মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়া

গিয়াছে, কিন্তু সেদিকে ডাক্তার বা ডাক্তার-গৃহিনী কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। তবে নিবিষ্ট ভাবে এই মহিলাটির দিকে লক্ষ্য রাখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি মনের কোন ভাবকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্যই এই ভাবে অকারণ হাসিয়া উঠেন—যেন কোন বিশেষ কথা মনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত হওয়ায় হাসির আবরণটি টানিয়া দেন। আরও লক্ষ্য করিলে উপলব্ধি করা যায় যে, থাকিয়া থাকিয়া তিনি যেন চমকিয়া উঠেন, যেন সর্বক্ষণই অতি সতর্ক—পাছে অসতর্ক মুহূর্তে মনের মধ্যে চাপা কথা বাহির হইয়া পড়ে! কাজেই, এ অবস্থায় তাঁহার হাসিটিকেও স্বাভাবিক বা সহজ ভাবের মনে হয় না। ইহাদের উপর তাঁহার কণ্ঠস্বরেও তেমন কোন মাধুর্য নাই,—যেন কাঠের উপর ঘা দেওয়া আওয়াজের মত ঠকঠকে।

স্বামীর লম্বা ডাক্তারী ডিগ্রী বা তজ্জনিত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দক্ষিণা দেবীর মনে কোন প্রকার উৎসাহের লক্ষণ কখনও দেখা যায় না। বরং যে আত্মীয় স্থানীয় বিচক্ষণ ডাক্তারটির সঙ্গে তিনি তরুণ যৌবনে ওদেশে গিয়াছিলেন এবং যাঁহার শিক্ষাধীনে নার্সিং বিদ্যাটি মোটামুটি ভাবে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিই সমস্ত অন্তরটি তিনি বিপুল শ্রদ্ধায় কানায় কানায় ভরাইয়া রাখিয়াছেন। সেই কৃতবিদ্য বিজ্ঞ চিকিৎসাব্রতীর আকস্মিক মৃত্যুর পরই তাঁহার শিক্ষা-জীবনে সব উলট পালট হইয়া যায়। একান্ত নিরূপায় অবস্থার মধ্যেই তাঁহাকে ডাক্তার বি, এল, বি'কে বিবাহ করিতে হয়। ওদেশে থাকিয়া তাঁহার আশ্রয়দাতা আত্মীয় ভদ্রলোকটি মোটামুটি ভাবে জীবিকানির্বাহ করিতেন এবং মৃত্যুকালে কিছু অর্থও রাখিয়া যান। সেই অর্থে কিছুকাল স্বামী-স্ত্রী সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া ওদেশে বসবাস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দক্ষিণা দেবী নার্সিং করিয়া কিছু কিছু উপার্জনও করিতেন। কিন্তু ডাক্তার বি, এল, বি কেবল মাত্র পূর্বতন ডাক্তারটির সুনাম ও প্রতিষ্ঠা ভাঙ্গাইয়া তাঁহার সঞ্চিত ও স্ত্রীর উপার্জিত অর্থে পূর্ববৎ চালের উপর দিনপাত

করিতেই অভ্যস্ত থাকিতেন। এরূপ অবস্থায় আরও দীর্ঘকাল অবস্থিতির পরিণতি উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধিমতী দক্ষিণা দেবী ডাক্তারকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া উক্ত ডিগ্রীগুলির সাহায্যে কোনও সমৃদ্ধ অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার জন্য যুক্তি পরামর্শ দিতে থাকেন এবং অবশেষে ডাক্তার তাঁহার নির্দেশ মত পাঞ্জাব প্রদেশের এই প্রসিদ্ধ সহরটিতে স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হন। দক্ষিণা দেবী স্বামীকে বলেন—'তোমার যেরকম কিসমত বা অদৃষ্টের জোর, তাতে লোকের নাড়ি টিপে আর বুকে নল বসিয়ে সুবিধা করতে পারবে না। বড় বড় ডিগ্রী, আর হাজার খানেক প্রেসক্রিপসন যখন তোমার হাতে, কোন একটা হাসপাতালে বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে চাকরী যদি বাগিয়ে নিতে পার, তাহলে সুখের মুখ দেখবে।'

ডাক্তার পত্নীর কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন—'তুমি কি আজকাল গণনা বিদ্যা শিখে ফেলেছ, যার ওপর জোর দিয়ে আমার কর্মপন্থা পর্যন্ত বাতলে দিচ্ছ?'

দক্ষিণা দেবী উত্তর দেন—'অন্ততঃ তোমার ভাগ্য লিপিটা গণনা করে দেখবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমার আছে। তাই বলছি, তুমি সেই চেষ্টাই দেখ। আর, লোক পটাবার মত যে রকম তোমার পটুতা তাতে ওরকম কোন চাকরী যোগাড় করতে পারলে, নাম যশ টাকা পয়সা সবই পাবে।'

ডাক্তার কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁহার নিজস্ব বুদ্ধি খাটাইয়া সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দেন এবং ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হইয়া থাকিলে এই পথেই তাঁহার শুভাগমন হইবে ভাবিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। ফলে, তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে এমন এক বাঞ্ছিত ব্যক্তির সহিত সংযোগ ঘটিয়া গেল যাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দরাজ হাতে ভগবতী বিদ্যাপীঠের উদ্দেশে বিপুল অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রও প্রচুর অর্থ ব্যয়ে একটি হাসপাতাল বা আরোগ্যশালা

প্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে যে সব আলোচনা হয়, তাহা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে।

এ পর্যন্ত কুমার সাহেব ডাক্তারের পত্নী সম্বন্ধে অন্ধকারেই ছিলেন। কিন্তু নার্সিং হোম প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে পরিচালিকার দায়িত্ব বহনে ডাক্তারের বিদূষী ও চিকিৎসা-বিদ্যা-পটিয়সী সহধর্মিনী সমর্থা জানিয়া, তাঁহার আনন্দ এরূপ উপচিয়া উঠে যে, সেই বাঞ্ছনীয়া মহিলাটিকে দেখিবার বা তাঁহার দক্ষতার পরিচয় লইবার আগেই সরদার-ভবনের এক বিশিষ্ট অংশে তাঁহাদের অবস্থিতি এবং সচ্ছল ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযুক্ত মোটা অঙ্কের একটা আর্থিক বরাদ্দ করিয়া তবে আশ্বস্ত হন।

এই বাড়ীরই একাংশে কুমার সাহেব তাঁহার খিতমতগার ও পরিচারকবর্গের সহিত রাজার হালে বসবাস করিয়া থাকেন। একটি মাত্র মানুষের জন্য পাঁচ ছয় খানি সুসজ্জিত ঘর, আরামদায়ক যাবতীয় বিলাস-সম্ভার, আধুনিক আসবাবপত্র এবং সাত আট জন কর্মঠ ব্যক্তিকে ব্যস্তভাবে মোতায়েন থাকিতে হয়। এমনই তাঁহার দপদপা যে, পাণ হইতে চুনটুকু পর্যন্ত খসিবার উপায় নাই, তাহা হইলেই অনর্থ ঘটিবে।

তাঁহার এই মহল্লায় প্রীতিভোজ ত প্রায়ই লাগিয়া আছে; সহরের গণমান্য বরেণ্য পরিবারের পরিজনবর্গের সমাগম হইয়া থাকে। সেই ভোজের আসরে নাচ গান মাইফেল প্রধান অঙ্গ রূপে উৎসবকে প্রাধান্য দান করে।

কুমার সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবদের সহিত ডাক্তারও এই উৎসবে আমন্ত্রিত হন। কুমার সাহেব ডাক্তারকে তাঁহাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন ডাক্তারী প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে লব্ধ দুর্লভ উপাধিমালায় ভূষিত এ হেন ডাক্তারটির সহিত আলাপ করিয়া পরিচিত হইয়া তাঁহারাও বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

আরোগ্য-ভবন সম্পর্কে ব্যবস্থা পাকা হইবার পর ডাক্তার হোটেল হইতে তাঁহার লট বহর তুলিয়া একদা সস্ত্রীক সরদার ভবনের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। খিতমতগারদের লইয়া স্বয়ং কুমার সাহেব তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া ডাক্তার গৃহিনীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার উদ্দেশে যুক্ত করযুগল ললাটে তুলিয়া 'নমস্তে' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেই নিমেষের মধ্যে তাহার মুখখানা যেন আর্তনাদের ভঙ্গিতে স্তব্ধ হইয়া পড়িল। সর্বনাশ! ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষিতা, শীতপ্রধান দেশের প্রবাসিনী বিদূষী নারীর এ কি বিশ্রী আকৃতি! আরোগ্যশালায় যাহারা আরাম ও শান্তির আশায় আশ্রয় লইতে আসিবে, এই চেহারা দেখিলেই ফিরিয়া যাইবে না ত?

কিন্তু ডাক্তারের বুদ্ধিমতী পত্নী ইতিমধ্যেই গাড়ী হইতে নামিয়া গলদেশে জড়ানো রেশমী চাদরখানি অবগুণ্ঠনের মত মাথার খানিকটা আবৃত করিয়া হাসি মুখে 'নমস্তে কুমার সাহাব' বলিয়া প্রতি নমস্কার করিতেই কুমার সাহেবের হুঁস হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠেন—'চলুন ডাক্তার সাহেব, আপনাদের ঘরগুলো আমি নিজে উপস্থিত থেকে দেখিয়ে দিই। যদি কোন অসুবিধা মনে করেন আপনার স্ত্রী, আমাকে দয়া করে হুকুম করলেই, আমি সব ঠিক করে দেব।'

ডাক্তার পত্নী সঙ্গে সঙ্গে হাসির ঝলক তুলিয়া চাপা গলায় কুমার সাহেবকে জানিয়ে দেন—'পাঞ্জাবে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যখন কুমার সাহেবের মত দিলদার ব্যক্তির দৌলতখানায় আশ্রয় পেয়েছি, কোন অসুবিধাই আমাদের হবে না। তা ছাড়া, আরোগ্যশালার সম্পর্কে যখন আমাদের আসা, আমাদেরই কাজ হচ্ছে যেখানে যা কিছু গলদ হবে, সেগুলো শুধরে দেওয়া।'

কথাগুলি কুমার সাহেবের অন্তরকে আকৃষ্ট করে। তিনিও সহর্ষে বলেন—'এইত আপনার মত বিদূষী নারীর যোগ্য কথা।

দেখুন, আমার অনেক দিনের সাধ এবং আমার চাচাজীর হুকুমও বটে, এই মোকামে একটা খয়রাতি আরোগ্যশালা খুলে দেব; দেশের মেয়েরা এসে সেবার ভার নেবে। কিন্তু এদেশের মেয়েরা যে এসব ব্যাপারে কত পিছিয়ে আছেন, সে ত জানতে আপনার বাকি নেই। এখন তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। কিন্তু মাথার উপরে আর যাঁরাই থাকুন, নির্ভর বা বিশ্বাস করবার মত এক জন মহিলা না থাকলে কেউ এখানে মেয়ে পাঠাবেনা শিক্ষার জন্যে। আপনাকে পেয়ে আমার আশা হচ্ছে, অনেকদিনের উদ্দেশ্যটি এবার সার্থক হবে।'

ডাক্তার গৃহিনী তেমনিই হাসির সুরে বলেন—'আমার দিক দিয়ে চেষ্টা যত্নের অভাব হবে না কুমার সাহেব। নার্সিং যারা শিখতে চায়, পড়া শোনাও কিছুটা করেছে, বেছে বেছে এমনই কতকগুলি মেয়ে যোগাড় করুন, তাদের তৈরী করে নেবার দায়িত্ব আমার।

ডাক্তার গৃহিনীর চেহারাখানি দেখিয়া কুমার সাহেব প্রথমে মুসড়াইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু সংলাপ-সূত্রে সেই কুদর্শনা মহিলাটির মুখের কথা শুনিয়া অনেকটা শান্তি পান এবং এই ধারণাই তাঁর মনে দৃঢ় হয় যে, 'আগাড়ি দর্শনদারী' কথাটি প্রচলিত থাকিলেও চেহারা যতই কুৎসিত হোক না কেন—গুণ থাকিলে তাহার জলুস স্বতঃস্ফূর্ত না হইয়া পারে না।

অতঃপর কুমার সাহেব নিজেই অগ্রবর্তী হইয়া ডাক্তার গৃহিনীকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তাঁহার সম্মুখেই বাসস্থানটি দেখিয়া তাঁহার অভিমত জানান, তাহা হইলে কুমার সাহেব নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

ব্যবহার্য মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত ঘরগুলি দেখিয়া ডাক্তার-গৃহিনী বুঝি হাতের কাছে স্বর্গের নাগাল পান। শয্যাগৃহ, বৈঠকখানা বা ড্রয়িং রুম, ভোজন কক্ষ, পড়াশোনার ঘর, পাকশালা প্রভৃতি ছাড়াও অন্যদিকে পাশাপাশি দুইখানি বড় বড় ঘর অতিরিক্ত

দেখিয়া ডাক্তার-গৃহিনী সানন্দে বলিয়া উঠেন—‘কুমার সাহেব যেন ভবিষ্যৎ ভেবেই আমাদের ব্লকটি সাজিয়ে রেখেছেন। আমরা ত দুটি প্রাণী, এদিকের ঘরগুলিই যথেষ্ট। তবে ওদিকে যে দু'খানা বড় বড় হল-ঘর আলাদা দেখছি, ওগুলোকেও নার্সিংএর কাজে লাগিয়ে ব্যবহার করা চলবে।’

কুমার সাহেব আপত্তির সুরে বলেন—‘না না, নার্সিংএর জন্যে এ-বাড়ীর বারো আনারও বেশী অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; আপনাদের কোয়ার্টারে ও-সব ঝামেলা আসবে কেন?—আপনাদের আত্মীয় স্বজন বা অতিথিদের জন্যই ঐ ঘর দু'খানা আলাদা দেওয়া হয়েছে; এই ব্লকেরই সামিল ও দুটো।’

ডাক্তার গৃহিনীর মুখের হাসি কুমার সাহেবের কথায় আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; সেই হাসির সঙ্গেই তিনি বলেন—‘আমাদের আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, আর অতিথির ঝামেলাও আমাদের ব্লকে কোন দিন হবে বলে মনে করি না। ঘর দু'খানা ব্লকের সঙ্গে অথচ একটু তফাতে দেখে ওদেশের ডাক্তারদের চেম্বারের কথা মনে পড়ে যায়। ওখানে এমন ধরণের রোগীও থাকেন, যাঁরা আরোগ্যশালায় সাধারণ ভাবে থাকতে চান না, নার্সিং হোমের অধ্যক্ষের বিশেষ তত্ত্বাবধানে তাঁরই কোয়ার্টারে তাঁদের রাখা হয়। আমরাও এখানে ঐ ঘর দুখানাকে বিশেষ রোগীদের জন্যেই যদি ব্যবহার করি, মন্দ কি।’

উৎফুল্ল মুখে কুমার সাহেব ডাক্তার গৃহিনীকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন—‘আপনার এই কথা থেকেই বুঝতে পারছি, আপনি এরই মধ্যে আরোগ্যশালাটির সম্বন্ধে কত ভেবেছেন; আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনার মত গুণবতী মহিলাকে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য পেয়েছি।’

সরদার-ভবনের উক্ত মহল্লায় ডাক্তার-দম্পতির প্রতিষ্ঠার মোটা-মুটি আখ্যায়িকা এইরূপ। ইহার পর নার্সিং হোম খুলিবার

আয়োজন চলিতে থাকে পরিপূর্ণ উদ্যমে। কিন্তু কুমার সাহেব ও তাঁহার এজেন্টগণ সমগ্র সহর তছনছ করিয়াও কোন ছাত্রীকে নার্সিং হোমের সংস্পর্শে আনিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের যাবতীয় উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়। সহরবাসী নরনারীর দৃষ্টি তখন ভগবতী বিদ্যাপীঠের দিকে। অধ্যাপক বীরমূর্তির সাম্প্রতিক বিবৃতি সমগ্র সহরে আলোচনার বিষয়-বস্তু হইয়াছে। কন্যা-ভগবতীদিগকে দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব, সাগ্রহে বিপুল কৌতূহলে সেই দিনটি গণনা করিতেছেন। এ অবস্থায় নার্সিং হোমে কন্যা পাঠাইবার কল্পনাও সম্ভবপর নহে।

ফলে, ভগবতী বিদ্যাপীঠের বিরুদ্ধে ডাক্তার বি' এল, বি'র ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ডাক্তার গৃহিনী স্বামীকে সান্ত্বনা দেন—'এ যে তোমার পাগলামীর মত আচরণ হচ্ছে। এত কথা জানো, মাথার মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ ত বরাবর চালিয়ে আসছ, অতগুলো দাঁত ভাঙ্গা খেতাব বাগিয়ে ফেলেছ, এত বড় একটা মেডিকেল হাউস খুলে বসেছ, অথচ তার ভিতরটি ভোঁ ভোঁ—ছাত্রী বলতে কেউ নেই। তা' ছাত্রী যখন জুটছে না, না হয় ছাত্রদের আনিয়ে—'

পত্নীর কথায় বাধা দিয়া ডাক্তার বলেন—'সে হবে না। কুমার সাহেবের ঝোঁক মেয়েরাই এখানে স্থান পাবে, তারাই শুধু নার্সিং করবে, সেইজন্যে এত টাকা তিনি ঢেলে চলেছেন। আর, তাঁর ধারণাও মিছে নয়, মেয়েরাই নার্সিং শিখে পরিচর্যা করে শুনলে তবে এখানে রোগীরা আসবে—বুঝেছ?'

গৃহিনী বলেন—হ্যাঁ, তা বুঝছি—ভালো করে তলিয়ে বুঝছি আর বুঝছি, সরদার ভবনের আরোগ্যশালায় কোন মেয়ে আসে না কেন? দেখ তোমার কুমার সাহেব তাঁর মেজাজের জন্যে দিলদরিয়া কাপ্তেন বলে মস্ত নাম করেছেন, কিন্তু ওঁর ঐ নামটিই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিবন্ধক। তুমিও কি বুঝতে পারছ না?'

ডাক্তার তখন হতাশভাবে বলেন—'কিন্তু আমরা যদি কোন

ৃপায় করতে না পারি, তাহলে আমাদের গুমরও ভেঙ্গে যাবে। বসে
।সে আমরাই বা কি করে কুমার সাহেবের টাকায় এভাবে নবাবী
চরি।'

ডাক্তার-গৃহিনী তখন পরামর্শ দেন—'তাহলে এক কাজ কর।
নাহোরে মেডিকেল কলেজের ক্লাসে আজকাল মেয়েরাও ভর্তি হচ্ছে
শুনিছি। খবরের কাগজে সেদিন দেখছিলুম—নার্সিং শেখাবার জন্যে
ওখানে একটা বে-সরকারী স্কুলও খোলা হয়েছে। কুমার সাহেব
যখন খরচের দিকে দৃক্‌পাত করছেন না, ওঁকে নিয়ে তুমি লাহোরে
চলে যাও; সেখান থেকে বেছে বেছে কতকগুলো মেয়েকে ভাঙ্গিয়ে
এনে তোমাদের নাসিং হোমে ভর্তি করে নাও। তার ফল ভালই
হবে, তখন ওদের দেখে অনেক মেয়ে এগিয়ে আসবে।'

পত্নীর এই যুক্তি ডাক্তারের অন্তর স্পর্শ করে এবং প্রস্তাবটি কুমার
সাহেবের নিকট তুলিবামাত্র তিনিও সানন্দে তাহার সমর্থন করিয়া
তৎক্ষণাৎ লাহোরে যাইবার দিন পর্যন্ত স্থির করিয়া ফেলেন।

ডাক্তার-গৃহিনী দক্ষিণা দেবী শুভক্ষণেই প্রস্তাবটি তুলিয়াছিলেন।
লাহোরে কতিপয় উৎসাহী ব্যক্তি সেই সময় একটি মেডিকেল স্কুল
খুলিয়া চিকিৎসা ও নার্সিং বিদ্যাশিক্ষার্থীদের অবাধ প্রবেশাধিকার
দেন। ফলে, বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায় হইতে নানাশ্রেণীর তরুণ
তরুণীরা প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহল লইয়া এই নূতন মেডিকেল স্কুলে
প্রবেশ করে এবং অনেকে প্রবেশকালীন মোটা রকমের টাকা
সংগ্রহের প্রতীক্ষায় থাকে। এই অবস্থায় কুমার সাহেব ডাক্তারকে
লাহোরে পাঠাইয়া দেন। তিনি তাঁহাদের নাসিং হোমের খয়রাতি
ব্যবস্থা ও হাতে-কলমে নার্সিং শিক্ষায় সুযোগ সুবিধার কথা তুলিয়া
কতকগুলি তরুণীকে সংগ্রহ করিয়া ফেলেন। কথা হয় যে, তাহারা
কুমার সাহেবের নাসিং প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইবার ও মাসিক বেতন
দিবার সকল দায় হইতে' ত মুক্ত থাকিবেই, উপরন্তু পরিধেয় পোষাক
পরিচ্ছদ ও বোর্ডিং-এর আহার্যাদির ব্যয়ভারও নার্সিং হোমের

পরিচালকগণ বহন করিবেন। এই ভাবে সংগৃহীত যে কুড়ি বাইশটি মেয়েকে লইয়া সরদার-ভবনের আরোগ্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহার ফল যে আশানুরূপ হয় নাই, ইতি পুর্বে কুমার সাহেবের সহিত ডাক্তারের সংলাপেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এতগুলি শিক্ষার্থিনীর পিছনে কর্তৃপক্ষের বিস্তর ব্যয় বরাদ্দ সত্ত্বেও রূপবিলাসী কুমার সাহেবের দৃষ্টির কষ্টি-বিচারে কেহই উত্তীর্ণা হইতে পারে নাই. শিক্ষা দীক্ষাও তাহাদের অপ্রচুর মাতৃভাষায় মোটামুটি খুব সাধারণ শিক্ষার উপর বড় জোর ইংরেজী ভাষায় প্রাথমিক শব্দবোধ হইয়াছে তাহার উপর শিক্ষা অপেক্ষা গল্পগুজব আমোদ-প্রমোদ ও সাজ-গোজের দিকেই তাহাদের লক্ষ্য প্রবল। অবশ্য ইহাদিগকে দেখিয় স্থানীয় কোনও কোনও সম্প্রদায় হইতে অল্প স্বল্প পরিমাণে ছাত্রী সমাগম হইতেছে বটে, কিন্তু তাহারাও শিক্ষার ব্যাপারে অনেকট পিছাইয়া রহিয়াছে।

এই অবস্থায় ভগবতী বিদ্যাপীঠের দিকে তাকাইয়া কুমার সাহেবও সেখানকার ভগবতীদের প্রকাশ প্রতীক্ষা করিতেছেন। সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য সুস্পষ্ট করিয়া তিনি ডাক্তারকেও বলিয়াছেন ডাক্তারও আনন্দদীপ্ত আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। লাহোরের প্রাথমিক মেডিকেল বিদ্যালয় হইতে ছাত্রী ভাঙ্গাইয়া আনিয় এখানকার স্থান যদি পূর্ণ করা সম্ভব হয়, বারো বৎসর ধরিয়া ভগবতী বিদ্যাপীঠে এক রহস্যময় সাধকের তত্ত্বাবধানে যে-সব কন্যা সুশিক্ষ পাইতেছে, তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহাদের নার্সিং হোমে প্রতিষ্ঠিত করাই বা দুঃসাধ্য হইবে কেন? টাকায় কি না হয় বিশেষতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী বহ্নিরাশি নির্বাপিত হইলেও তাহার লেলিহান শিখায় পৃথিবীর যে বিপুল পণ্য-সম্পদ ধ্বংস হইয় গিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে আর্থিক অভাব দুনিয়া ব্যাপিয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেখানে আর্থিক অস্ত্র একেবারেই অব্যর্থ।

এখন ভগবতী বিদ্যাপীঠের বিদুষীরা কি ভাবে তাহাদের বিদ্যার

পরিচয় দিবে তাহা জানিবার জন্য পাঞ্জাব প্রদেশের এই বিশিষ্ট নগরীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন প্রত্যেক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গ কৌতূহল-উদ্রিক্ত অন্তরে নির্দিষ্ট দিনটির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

॥ চার ॥

বিপুল জনসমাগমের সম্ভাবনা বুঝিয়াই অধ্যাপক বীরমূর্তি বিদ্যাপীঠের বিশাল অঙ্গনে সুবৃহৎ মণ্ডপ নির্মাণ করাইয়া শুভানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সহর ও সহরতলীর শিক্ষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন সকল সম্প্রদায়ের সুধীবৃন্দকে এবং বাছিয়া বাছিয়া শিক্ষানুরাগিণী মহিলাগণকেও আমন্ত্রণ করেন। তখনও ভারতীয় নারীসমাজ প্রকাশ্য সভায় অবাধে পুরুষদের পংক্তিতে আসন গ্রহণ করিতে অভ্যস্তা হন নাই। সুতরাং তাঁহাদের জন্য মণ্ডপে বৃতিবদ্ধ স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট থাকে। ফলতঃ, অনুষ্ঠানটি এরূপ কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল যে নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিশাল মণ্ডপে সমাকীর্ণ আমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলাদের আসনগুলি পূর্ণ হইয়া যায় এবং বিপুল আগ্রহে তাঁহারা নির্দিষ্ট ক্ষণটির প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। মণ্ডপের সম্মুখে উচ্চ পাটাতনের উপর সুদৃশ্য একটি মঞ্চ শোভা পাইতেছিল। নির্দ্ধারিত সেই ক্ষণটির উপস্থিতির সঙ্গে শঙ্খধ্বনি সহকারে মঞ্চের উপর প্রসারিত যবনিকা অপসৃত হইতেই মঞ্চমধ্যে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত সরদার ভগবতীপ্রসাদের পুষ্পমাল্য ভূষিত সুবৃহৎ তৈলচিত্রখানি সভাসীন সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। পরক্ষণে বিদ্যাপীঠ পরিচালক অধ্যাপক বীরমূর্তি মণ্ডপে সমবেত নরনারীবর্গকে অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সৌম্য দেহশ্রী, শুভ্র বেশভূষা ও দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রুরাজির সংযোগে বিনম্র ভঙ্গিটি দেখিয়া, সমাগত সকলেরই মস্তক

শ্রদ্ধায় অবনত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মঞ্চ হইতে উদাত্ত কণ্ঠে অভ্যাগতগণকে স্বাগত সম্ভাষণ পূর্বক যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্টা শিক্ষাব্রতচারিণী ছাত্রীদের সমাবর্তন-ভাষণরূপেই সকলের অন্তর স্পর্শ করিল। তাঁহার অভিভাষণে ভাবের আবেগ বা ভাষার উচ্ছ্বাস নাই। প্রত্যেক কথা সুস্পষ্ট, বাস্তব, প্রত্যেকের উপলব্ধি করিবার মত। তিনি প্রথমেই বারো বৎসর পূর্বে অনুষ্ঠিত এই সহরেই নারীজাতির শিক্ষার উপর আলোকপাত করিবার উদ্দেশ্যে যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন: তখনও দেশে স্ত্রী শিক্ষা বিশেষভাবে প্রচারের সুযোগ পায় নাই; অথচ, পূর্ণাঙ্গ জাতির সংযোগে দেশকে পরিপুষ্ট করতে হলে নারীদিগকেও শিক্ষিতা করে তুলতে হবে, শিক্ষার প্রভাবে তাহাদেরও জাগরণ না হইলে দেশের কল্যাণ নাই। তবে তাহাদের শিক্ষার ধারা ও শিক্ষাদানের প্রণালী হবে আলাদা। পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যদেশের আধুনিক শিক্ষা এবং আমাদের গৌরবময়ী জন্মভূমি ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির অনুশীলন করে আমি যে সত্যের সন্ধান পেয়েছি, সেই ধারা অনুসারেই এদের শিক্ষা দেব; প্রাথমিক অবস্থা বলে এদের শিক্ষিতা করে তুলতে কিছু দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হবে। তারপর দেশবাসীর সমক্ষে আমার শিক্ষাধীনা ছাত্রীরাই পরীক্ষা দেবে—কিভাবে তারা শিক্ষালাভ করেছে এবং তাদের শিক্ষা দেশের প্রয়োজন কিভাবে সিদ্ধ করবে। সেই পরীক্ষার দিন আজ উপস্থিত।

ইহার পর তিনি শ্রদ্ধাসহকারে সরদার ভগবতীপ্রসাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিলেন: দেশ ও জাতির কল্যাণকল্পে কেউ যদি উদ্যোগী হন, সত্যাশ্রিত বলিষ্ঠ পরিকল্পনা জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করে, যতই তা ব্যয়সাধ্য বা দুর্বহ হোক না কেন, মঙ্গলময় ভগবানের প্রসাদে তাঁরই কৃপাচিহ্নিত বিশিষ্ট ব্যক্তি সহর্ষে সাড়া দিয়ে সে কার্য সিদ্ধ করতে এগিয়ে আসেন। তার সাক্ষী এই বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা

মহাত্মা ভগবতাপ্রসাদ। আজ তিনি এখানে সশরীরে উপস্থিত থাকলে সেদিনের সেই প্রতিশ্রুত আমি কি ভাবে পালন করেছি, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করতেন, আমিও ধন্য হতাম। কিন্তু তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করলেও, আশাবাদী আমরা—আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসী আমরা, নিশ্চয়ই এই আশা পোষণ করব যে, তাঁর আত্মা অদৃশ্য ভাবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতিকৃতি আশ্রয় করে সাগ্রহে কন্যা-ভগবতীদের সুদীর্ঘ সাধনার ফল প্রত্যক্ষ করছেন। এই প্রসঙ্গে আমি এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অভ্যাগত শিক্ষাব্রতীদের উদ্দেশে সবিনয় নিবেদন করছি যে, এই বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের শিক্ষা সমাপ্ত করতে অনেকগুলি বৎসর অতীত হয়েছে। এই বিলম্বের মূলে ছিল শিক্ষাদানের উপযোগী করে বিভিন্ন শিক্ষাস্থান নির্মাণ। শিক্ষার্থিনীদের সবেমাত্র জ্ঞানোদয় হয়েছে—যে-বয়সে পুতুলখেলা আর গল্প শোনার মধ্যেই তাদের আগ্রহ সীমাবদ্ধ থাকে, সেই শিশুকালেই তাদের আশ্রমিক জীবনের আরম্ভ হয় এখানে। তারপর, দেশ ও সমাজের আবেষ্টনও তখন অন্যরূপ ছিল, সেই জন্য এদের প্রত্যেকটিকে শিক্ষিত করে তুলতে দীর্ঘ সময়ের সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে। ইতিমধ্যে এমন একটি পরিবর্তন ঘটে গেছে যার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ ও জাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, এমন কি ব্যক্তিগত প্রকৃতি পর্যন্ত বিকৃত হয়ে পড়েছে। সেটি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এক মহাসংগ্রাম। এই বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের তরুণ জীবনের প্রায় তিন ভাগ নিয়ে এই যুদ্ধের আবহাওয়া বয়ে গেছে। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধকালে বিদ্যাপীঠের অভ্যন্তরে এদের শিক্ষার সাধনা চললেও বহির্জগতের সকল তথ্যেই এদের জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়েছে। সে সব পরিচয় আপনারা এদের কাছ থেকেই জ্ঞাত হবেন। ভূমিকায় বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

অবশেষে অধ্যাপক বলিলেন ঃ দেখুন, বিস্তীর্ণ মণ্ডপে আপনাদের বসবার ব্যবস্থা করে, আমরা এই মঞ্চটি বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের জন্য

নির্দিষ্ট করেছি ; এখান থেকেই এঁদের বিদ্যার পরীক্ষা দেবার সুবিধা হবে বলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর, অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবার জন্য যিনি এই শুভ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে অনুগ্রহ করে সম্মতি দিয়েছেন, ভারতমাতার বর্তমান সুসন্তানগণের মধ্যে তিনি একজন স্বনামধন্য পুরুষ—ভারতের বরেণ্য নেতৃবর্গের অন্যতম, পাঞ্জাব-গৌরব লালা লাজপত রায় মহাশয়। বিদ্যাপীঠের সৌভাগ্য-ক্রমে এই সহরে তাঁর শুভাগমন হওয়াতেই আমরা তাঁর অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়েছি। স্বল্প সময়ের মধ্যে এটি সম্ভব হওয়ায় আমরা বিশেষভাবে বিজ্ঞপ্তি দিবার সুযোগ পায় নাই। আপনাদের সমক্ষে আমি এই বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে দেশের এই প্রখ্যাত গুণী ও মানী ব্যক্তিকে সভাপতির আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি।

অধ্যাপকের উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল মণ্ডপ সহর্ষ করতালির ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল এবং তাহারই মধ্যে সৌম্যমূর্তি দেশনেতা লালা লাজপত রায় মঞ্চে নীত হইয়া যথাযথভাবে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন।

সভাপতির সম্মুখবর্তী টেবিলের উপর অনুষ্ঠানটির অবধার্য কার্য-ধারার তালিকাটি প্রস্তুত ছিল। তদ্দৃষ্টে সভাপতি মহাশয় প্রথমেই বলিলেন : এই বিদ্যাপীঠের ভিতর থেকে শিক্ষা-সিদ্ধা পনেরোটি কন্যা আজ তাঁদের অধীত শিক্ষা সম্বন্ধে আপনাদের সম্মুখে পরীক্ষা দেবেন। আমি একে একে তাঁদের নাম আহ্বান করছি এই মঞ্চে উপস্থিত হবার জন্য।

অতঃপর সভাপতির আহ্বান অনুসারে একে একে পনেরোটি ছাত্রী মঞ্চে উপস্থিত হইয়া প্রথমে মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি ও অধ্যাপক এবং তারপরে অভ্যাগতবর্গকে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে অভিবাদনপূর্বক মঞ্চের একদিকে তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্ট হইল। প্রত্যেক ছাত্রীর নামের সঙ্গে বর্তমান বয়স এবং যে-প্রদেশ হইতে তাহাকে আনা হইয়াছে, সেগুলিও সভাপতি মহাশয়

তালিকায় লিখিত বিবরণী দৃষ্টে উল্লেখ করিতেছিলেন। পনেরোটি ছাত্রী যথাক্রমে এই ভাবে আহূত হইলে প্রকাশ পাইল যে, বয়সের দিক দিয়া তাহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বা তারতম্য নাই—সপ্তদশের সীমা হইতে কেহ নামে নাই বা অষ্টাদশের সীমা অতিক্রমও করে নাই। পনেরোটি ছাত্রীর মধ্যে আটটি পাঞ্জাব প্রদেশের কন্যা, দুইটি মদ্রদেশের, দুইটি বোম্বাই এবং একটি করিয়া কন্যা মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও বাঙলাকে তাহাদের জন্মস্থানরূপে ভগবতী বিদ্যাপীঠের সংশ্রবে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

অতঃপর সভাপতি সহর্ষে বলিলেন: আপনারা জেনেছেন যে, এই ১৫টি মেয়ের মধ্যে ৮টি এখানকার, বাকি ৭টি ভিন্ প্রদেশের মেয়ে—পাঞ্জাবের সঙ্গে আচার ব্যবহার, ভাষা চাল চলন প্রভৃতির যেখানে কোন মিল নেই। কিন্তু শিক্ষা ও সহবতের গুণে এমনি করে তৈরী হয়েছেন—যেন এঁরা একই পরিবারের ১৫টি ভগিনী। অধ্যাপক মশাই আমাকে এ কথা গোড়াতেই আপনাদের কাছে বলবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। এই ১৫টি মেয়ে নিজের নিজের প্রদেশ ভূমির সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশকে ভালবাসতে শিখেছেন। এঁদের কাছে সারা ভারতবর্ষ যেন একখানা সাজান বাড়ী, আর—ভারতের সব লোক যেন সেই বাড়ীর একটা বড় গোষ্ঠী। এমনি করে এঁরা নিজের প্রদেশকে আগে চিনে, তারপর সারা দেশকে চিনেছেন। কি করে দেশকে আর দেশের লোককে ভালবাসতে হয়, সে শিক্ষাও পেয়েছেন এঁরা প্রত্যেকেই। সেই জন্যে এঁদের কাছে কেউ পর নয়—সবাই আপনার। এমনকি, ভারতবর্ষের বাইরে যে বিরাট দুনিয়া পড়ে আছে, এঁরা তাকেও বুঝতে শিখেছেন—তাই সেখানকার মানুষদের উপরেও এঁদের দরদের কমতি নেই। আমি ত একথা শুনে অবাক হয়ে গেছি! সারা বিশ্বকে ভালবাসতে পারা কি বড় সহজ কথা? সেকালে ঋষিরা তপোবনের আশ্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের এই শিক্ষা দিতেন বলেই প্রাচীন ভারতে গ্রামকে কেন্দ্র করে

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে উঠেছিল। অধ্যাপক বীরমূর্তি মহাশয়ও জাতির অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তির উপর বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমনভাবে তাঁর ছাত্রীগুলিকে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করেছেন যে, সাংসারিক জীবনে তেমন সুযোগ সুবিধা পেলে এঁরা প্রত্যেকেই যাতে দেশের পুরুষ ও নারী নাগরিক নিয়ে এক একটা বিশাল যৌথ পরিবার গড়ে তুলতে পারেন। তারই কিছুটা আভাস আপনারা এঁদের আলোচনার মধ্যেই পাবেন। এঁরা এখানেই আপনাদের সামনে আমাদের দেশের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করবেন; আপনারাও এঁদের কাছ থেকে আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্যাগুলির সঙ্গে সমাধানের উপায়ও জানতে পারবেন। অধ্যাপক মহাশয়ের বিশ্বাস যে, এ থেকেই আপনারা প্রথমে এঁদের শিক্ষা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় পাবেন। এখনই আলোচনা আরম্ভ হবে। অবিশ্যি, সকলের বোধগম্য হবে বলে যদিও এঁরা হিন্দী ভাষাতেই আলোচনা করবেন, কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষ ভাষাগুলির সঙ্গে ইংরেজী ভাষাও এঁদের আয়ত্ত হয়েছে, এ থেকে আপনারা তারও আভাস পাবেন। এখন আমি অনুরোধ করছি, অধ্যাপক বীরমূর্তি মহাশয় এঁদের এই আলোচনার ব্যাপারটি পরিচালনা করুন।

অধ্যাপক বীরমূর্তি বলিলেন: যে সব বিচক্ষণ মনীষী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবাসীর দুঃখ, দুর্দশা ও অসুবিধা দূরীকরণের ব্রত গ্রহণ করে নেতৃস্থানীয় হয়েছেন, সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। বিদ্যাপীঠের কন্যাদের এবং সেই সঙ্গে আমারও পরম সৌভাগ্য এই যে, তাঁরই সমক্ষে দেশের এই পনেরোটি কন্যা প্রত্যেকেই দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ পাচ্ছে। এদের আলোচনার ধারা থেকেই নেতৃস্থানীয় অভিজ্ঞ সভাপতি মহাশয় উপলব্ধি করতে পারবেন যে,

শুধু ভারতবর্ষ নয়—নিখিল বিশ্বের আজকের অবস্থার সঙ্গেও এদের পরিচয় আছে।

অতঃপর একটু থামিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্টা কন্যাদিগকে উদ্দেশ করিয়া অধ্যাপক বলিলেন: এখন তোমাদের আলোচনা আরম্ভ হোক—যেভাবে তোমরা স্থান পেয়েছ, পর পর উঠে আলোচনায় যোগ দেবে। অনসূয়া বাঈ, তুমি প্রথমেই আছ, তোমাকেই আরম্ভ করতে হবে; আর সবার শেষে চণ্ডীকে দেখছি —সেই শেষ করবে।

অনসূয়া বাঈ নাম্নী মারাঠী-মেয়েটি উঠিতেছিল, কিন্তু তার আগেই সারির শেষ-প্রান্ত হইতে চণ্ডী সবেগে উঠিয়া সভাপতিকে সম্বোধন করিয়া অভিযোগের ভঙ্গিতে বলিল: আমাদের আলোচনার আগেই মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি চাইছি—কিছু বলবার উদ্দেশ্যে।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে চণ্ডার এই আচরণে শ্রেণীবদ্ধা কন্যাদের সহিত স্বয়ং অধ্যাপক মহাশয়ও বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কিন্তু সভাপতি সস্মিত-মুখে বলিলেন: বেশ, বল!

মণ্ডপশুদ্ধ সবার উৎসুক দৃষ্টি তখন চণ্ডীর দিকে। তাহার অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত দেহ-সৌষ্ঠব ও দাঁড়াইবার ভঙ্গি সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছে—দৈহিক সম্পদে অতুলনীয়া পাঞ্জাবী নারীরাও নিস্পলক-নয়নে এই মেয়েটির দীর্ঘায়ত ঋজুদেহ, উন্নত তীক্ষ্ণ নাসিকা, আয়ত দুইটি চক্ষুর জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রশান্ত মুখখানি লক্ষ্য করিতেছিল।

এই মেয়েটি কি বলে, তাহা শুনিবার জন্য জনপূর্ণ বিশাল মণ্ডপ একেবারে নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চণ্ডী পুরুষ অভ্যাগতদের প্রথম সারির দিকে তর্জনী নির্দেশে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিল: মাননীয় সভাপতি মহাশয় দেখুন—বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তিদের মধ্যে বসে এক ব্যক্তি অভদ্রের মত আমাদের দিকে দূরবীণ কষছেন?

চণ্ডীর কথার সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি হইতে সভাস্থ সকলেই লক্ষ্যস্থলে চক্ষু ফিরাইতেই ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হইল। ডাক্তার বি, এল, বি তখন নারী-কণ্ঠের তীব্র প্রতিবাদে সচেতন হইয়া বিদেশী যন্ত্রটি নামাইয়াছেন, কিন্তু লুকাইবার চেষ্টা করেন নাই বা সে সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আগ্রহও নাই। বরং বহু কণ্ঠের নিন্দা ও শ্লেষাত্মক স্বরে তাঁহার মুখখানিও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

বিশাল মণ্ডপের বিভিন্ন অংশ হইতে তখন বিভিন্ন ভাষায় ধ্বনি উঠিয়াছে—শেম্-শেম্। ধিক্-ধিক্! সরম কী বাত হ্যায়!

সভাপতি মহাশয় এই অবস্থায় আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহিলাদের কতিপয় সারির পর বিশিষ্ট ভদ্র-ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট আসনের প্রথম সারিতেই কুমার সাহেব দেবীপ্রসাদের ঠিক পার্শ্বেই বসিয়া ডাক্তার বি, এল, বি মঞ্চে কন্যাদের আবির্ভাব কাল হইতেই যে দূরপীণ্ ব্যবহার করিতেছিলেন, ইহা চণ্ডীর পূর্বে কেহই লক্ষ্য করেন নাই। সভাপতি মহাশয়কে আসন ছাড়িয়া উঠিতে দেখিয়াই কুমার সাহেব তাঁহার হাত হইতে দূরপীণ্টি ক্ষিপ্রভাবে টানিয়া লইলেন। সভাপতির দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ থাকায় ব্যাপারটি বুঝিয়া তিনি অনুযোগের সুরে বলিলেন: সত্যই এটা খুবই লজ্জার কথা; আজিকার এই সাংস্কৃতিক সভায় আপনার এই আচরণ বা অভ্যাসটি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। আশা করি, ভবিষ্যতে কোন সভায় এভাবে ভদ্র-মহিলাদের প্রতি দূরপীণ ব্যবহার করবেন না।

ভদ্রভাবে এই মন্তব্য করিয়া সভাপতি পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সভামণ্ডপে তখনও বিভিন্ন কণ্ঠে ধ্বনি হইতেছিল: শেম্-শেম্—নির্লজ্জ, বেহায়া!

ডাক্তার বি, এল, বি নীরব থাকিলে এখানেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হইত কিন্তু তিনিও এই সময় আসন হইতে উঠিয়া কঠিন মুখে

বলিলেন ঃ আমি ডাক্তার, বিদ্যার্থিনীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই দূরবীণ্ ব্যবহার করেছিলাম।

চণ্ডী তাহার স্থানেই যাইতেছিল, কিন্তু ডাক্তারের মুখে এ-কথা শুনিবা মাত্র সে সবেগে পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ববৎ দৃঢ়স্বরে বলিল ঃ কিন্তু আপনাকে সে অধিকার নিশ্চয়ই দেওয়া হয় নাই—আর স্বাস্থ্য পরীক্ষার যন্ত্রও স্বতন্ত্র, ও বস্তু নয়।

চণ্ডীর এই যুক্তিযুক্ত কথায় নারী-পুরুষের উল্লসিত কণ্ঠ হইতে 'হিয়ার-হিয়ার' 'সাধু-সাধু' ধ্বনি উঠিয়া মঞ্চ মুখরিত করিয়া তুলিল।

ডাক্তার অধৈর্যভাবে ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন ঃ আমাকে এভাবে অপমান করার অর্থ হচ্ছে—কুমার সাহেব দেবীপ্রসাদজীর মর্যাদার উপরেও রীতিমত আঘাত করা। আজকের বিদূষীরা ভুলে গেছেন বোধ হয়—এঁরই চাচাজীর টাকায় ভগবতী বিদ্যাপীঠের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

কুমার সাহেব জোর করিয়া টানিয়া ডাক্তারকে তাঁহার আসনে বসাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বিনীত কণ্ঠে বলিলেন ঃ ডাক্তার সাহেবের এই মন্তব্যের জন্য আপনাদের কাছে মাপ চাইছি। আমার স্বর্গত চাচাজীর বদান্যতার জন্য বংশধর হিসাবে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। ডাক্তার সাহেব ওভাবে কথাটা বলে সত্যই অনধিকার চর্চা করেছেন ঃ এর জন্য নিশ্চয়ই উনি অনুতপ্ত হয়েছেন।

কুমার সাহেবের বিনীত আবেদন সভার শান্তি কতকটা ফিরাইয়া আনিল এবং ডাক্তারও তৎক্ষণাৎ অবস্থাটি উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পূর্বোক্ত অশিষ্ট মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেই সমগ্র মণ্ডপ পূর্ববৎ নিস্তব্ধ হইল। সভাপতির নির্দেশে অনসূয়া বাঈ আলোচনা আরম্ভ করিল ঃ আমরা এখন যে যুগে বাস করছি, তাকে বিংশ শতাব্দী বলা হয়। এটি হচ্ছে রীতিমত ওলট-পালট বা পরিবর্তনের যুগ। যে দিকেই আমরা তাকাইনা কেন, দেখতে পাই—নানা রকম ভাঙ্গাট, রাশি রাশি প্রশ্ন, অসংখ্য সমস্যা। এই সঙ্গে আরও দেখি

যে, নূতন নূতন উপাদান, প্রচুর প্রাণশক্তি প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে পুরাতনের পরিবর্তন করে চলেছে এই যুগটি ; সঙ্গে সঙ্গে সমাজ রাষ্ট্র শিক্ষা সংস্কৃতি সব দিকেই রূপান্তর ঘটছে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র কি অশান্তি ও বিক্ষোভ! সব দেশেই এক অভূতপূর্ব চিত্তকম্প চিন্তা-আন্দোলন চলছে। সমস্ত সভ্য-জগত এর আগে এমন করে একই সময়ে নড়ে ওঠেনি। পাতালে বসে পুরাণের বাসুকি বুঝি তাঁর সবগুলি মাথা একসঙ্গে নাড়া দিয়েছেন—তাই সব দেশই ত্রস্ত, কম্পিত, আর্ত। পাঁচ-পাঁচ বছর ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে যে মহা-যুদ্ধের ঝড় বহে গেল—এমনটি কখনও হয়নি। যেমন অসংখ্য লোক ক্ষয় হয়েছে, যুদ্ধের আগুনে তেমনি পৃথিবীর ধন-সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এর প্রতিক্রিয়া ত আছেই। তাই আজ দিকে দিকে জেগে উঠেছে জনগণের অসন্তোষ—যার অধিকাংশই যুদ্ধের দরুণ সঞ্জাত অর্থনীতি থেকে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ নির্লিপ্ত থাকতে পারেনি। বিপন্ন বিদেশী সরকারের অনুরোধ-মিনতি প্রতিশ্রুতির মোহে নানাভাবে তার অফুরন্ত অর্থ, বিপুল জনবল, রাজভক্তি, শক্তি, বুদ্ধি সব-কিছুই মিত্র-শক্তির অনুকূলে যুদ্ধের বহ্নিতে আহুতি দিয়েছে। তার ভরসা ছিল, যুদ্ধের পর সরকার প্রতিশ্রুতিমত দেশবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিলেই নেতৃবর্গ আর্থিক সমস্যার সমাধান করে দেশবাসীদের অভাব-অভিযোগ-অসন্তোষ ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করবেন। কিন্তু এখনো সরকার সে সম্বন্ধে নির্বাক রয়েছেন ; এর উপর যুদ্ধে জয়ী হয়ে যে-সব ভারতীয় যোদ্ধা দেশে ফিরে এসেছেন, যুদ্ধের সময় গোরা ও ওদেশের অন্যান্য সেনাদের তুলনায় তাদের প্রতি সব দিক দিয়েই বিশেষ রকম তারতম্য করায় তাঁরাও বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অথচ, এই ভারতীয় যোদ্ধারাই প্রাচ্যের ইরাণে ও প্রতীচ্যের ভার্দুনে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তাতেই জার্মানদের দুর্বার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছিল। আমাদের নেতৃবর্গ এই ঘটনায়

বিচলিত হয়ে সরকারকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ ক'রে দিয়ে বোঝাপড়া করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দেশবাসী এখন তাকিয়ে আছেন সরকার ও নেতাদের দিকে। এই অবস্থায় আমাদের দেশের নারীসমাজ কি উদাসিনী দ্রষ্টার মত নীরবে চেয়েই থাকবেন? আমাদের কি কোন কর্তব্যই নেই?

অনসূয়া বাঈ দৃঢ়স্বরে তাঁর উক্তির উপসংহারে এই প্রশ্ন করিতেই অধ্যাপকের নির্দেশে বসুন্ধরা ভার্গব নাম্নী পার্শ্ববর্তিনী ছাত্রী তাঁহার আলোচনা আরম্ভ করিলেন এবং তাতেই অনসূয়া দেবীর প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। বসুন্ধরা দেবী বলিলেন: বিধাতা তাঁর সৃষ্টি অপূর্ণ রেখে মানুষের উপর তাকে পূর্ণ করে তোলবার ভার দিয়েছেন। এই পূর্ণ করবার প্রাণধর্ম হচ্ছে—পরিবর্তন। পরিবর্তনশীলতাই জীবনের সাক্ষ্য। এর মূলে থাকে চিন্তাশীলতা। যে দেশে যত বেশী চিন্তাশীল ব্যক্তি থাকেন, সেই দেশে তত সহজে সমাজ-সংস্কার হয় ও সেই সঙ্গে জটিল সমস্যাগুলিও সমাধানের পথে এগিয়ে যায়। তখন এঁদের কর্তব্য হয়—দেশবাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে, তাঁরা দেশ ও সমাজকে যে অবস্থায় পেয়েছিলেন, তার চেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ করে রেখে গেলেন। বিধাতাকেও তাঁরা প্রত্যেকেই যেন বলতে পারেন—তাঁর উপর যে গুরু-ভার পড়েছিল, তার কিছুটা তিনি লাঘব করেছেন। এঁরাই হচ্ছেন দেশের মাথা—নেতা। দেশে যখন পরিবর্তন আসে, এঁরাই দেশবাসীকে জানিয়ে দেবেন যে, কার কোথায় স্থান, কি তার কর্তব্য। কিন্তু আজকের এমন একটা পরিবর্তনের যুগে সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, দেশ ও সমাজের কাজে নারীদের কোন হাত নেই। অথচ, নারীরা হচ্ছে সমাজের কেন্দ্রশক্তি। এর কারণ হচ্ছে, এ যুগে শিক্ষার ব্যাপারে নারীরা বরাবরই পিছিয়ে আছেন—স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারই হয়নি আমাদের দেশে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে খুব সাধারণভাবে বই পড়তে, আর নাম-সহী করতে পারে, এমন

মেয়ের সংখ্যা শতকরা ১৪।১৫ জন মাত্র। কোন কোন প্রদেশে আরো কম। বিদ্যার আলো অন্তরে পড়লে, তবেই অন্ধকার কেটে জ্ঞান-বুদ্ধি ফুটে ওঠে; আর এর জন্যই মানুষ পশু থেকে পৃথক হয়। জ্ঞান ও বুদ্ধি যত বাড়বে, মানুষের চিন্তাশক্তিও ততই প্রখর হবে; তখন নিজের সংসার ছাড়াও সমাজের ভালো-মন্দ ভাববার ক্ষমতা পাবে। এই শিক্ষাটি এমনি মজার জিনিস যে, এর প্রভাবে মন থেকে কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা একে একে সব সরে যায়। কাজেই মানুষ হতে হলে প্রথমেই চাই এই শিক্ষা। কেবল লেখাপড়াই শিক্ষার অঙ্গ নয়, তার সঙ্গে শিল্প, সঙ্গীত, ছবি-আঁকা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, চিকিৎসা-বিদ্যা, ধাত্রী-বিদ্যা, রোগীর সেবা, রান্নাবান্না, খাদ্য-বিচার—এগুলিও হাতে-কলমে শিখে পাকাপোক্ত হতে পারলে তবেই হবে শিক্ষা সম্পূর্ণ। স্বাস্থ্যবিধি না শিখলে আমরা কখনই শরীরকে মজবুত ও কর্মঠ করতে পারব না। ওদেশের মেয়েদের তুলনায় এই শিক্ষার ব্যাপারে আমরা এখনো একশো বছর পিছিয়ে আছি। আমরা যখন বিদ্যাপীঠে শিক্ষা আরম্ভ করি, দেশে তখন মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ বাঁধাধরা ব্যবস্থা ছিল না; কোনো মেয়ের হাতে বই দেখলে পুরুষরা চমকে উঠতেন, ঠাট্টা করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু এখন দেশের বড় বড় সহরে স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে। এই যে, আমাদের শিক্ষার মধ্যে একটা জগৎ-জোড়া যুদ্ধ হয়ে গেল, এতে এ-দেশের মেয়েদের কিছু না হোক, ওদেশের মেয়েরা অনেক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার পেয়েছে—কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার পথে যে-সব বাধা ছিল, সব সরিয়ে দিয়েছে এই যুদ্ধ। ওদেশের সমর্থ পুরুষদের সকলকেই যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটতে হলো, সে সময় মেয়েরা তাদের জায়গায় বসে দিব্যি কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। লেখাপড়া, স্বাস্থ্য-বিদ্যা, সেবা-শুশ্রূষা, শিক্ষার কাজ—এ সব আগে থেকে জানা ছিল বলেই তারা পুরুষদের কাজগুলি সিদ্ধ-হস্তে শেষ করে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে

প্রতিপন্ন করল যে পুরুষদের চেয়ে তারা কোন অংশে কম নয়। অথচ, এই যুদ্ধের আগেও মেয়েদের অধিকার লাভের সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল ; ও-দেশের নারী-আন্দোলনকারিণী 'সাফ্রেজিষ্ট' মহিলাদের নেত্রী-রূপিণী মিসেস প্যাঙ্কহার্ষ্টকে বিলেতের সরকার বন্দিনী করে কারাগারে পাঠাতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময় ঘটা করে তাঁর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এ-দেশে যদিও এ-যুদ্ধ পুরুষদের পক্ষে কতকগুলো নিষিদ্ধ পথ খুলে দিয়েছে, কিন্তু মেয়েরা পড়ে আছে যে তিমিরে, সেই তিমিরে। তবে এই যুদ্ধের পর অর্থনীতির কাঠামো যেভাবে ভেঙে পড়বার মত হয়েছে, তাতে মেয়েদের সামনেও অর্থ উপার্জনের উপায় এসে পড়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। কিন্তু তার আগে যোগ্যতা লাভ করতে হবে এ-দেশের প্রত্যেক মেয়েকে। এই যোগ্যতা অর্জনের সোনার কাঠি হচ্ছে শিক্ষা—এ-কথা প্রত্যেক মেয়েকে মনে রাখতে হবে। এই যুদ্ধ একটা যুগ-পরিবর্তন এনেছে, এর সুযোগ আমরাই বা কেন না নেব ?

ইহার পর যুদ্ধজনিত পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল এবং একে একে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ছাত্রীরাও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিলেন। তাহার মোটামুটি মর্ম এইরূপঃ ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত এই যে কটা বছর ধরে মহাযুদ্ধের ঝড় বহে গেছে সারা দুনিয়ায়, অনেক পরিচিত ব্যবস্থা তাতে ওলট-পালট হয়ে গেছে। এ থেকেই দেখা দিয়েছে নানা প্রকারের পরিবর্তন। ফরাসী-দেশে এমনি এক রাষ্ট্র-বিপ্লব প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদের আভিজাত্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সারা বিশ্বকে শুনিয়েছিল সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী। কিন্তু সেই বিপ্লবলব্ধ পরম সম্পদের সাহায্যে দেশের ক্ষমতাহারা স্বার্থপর সুবিধাবাদীদের চক্রান্ত আর এক নূতন উপদ্রব সৃষ্টি করে বসে। তারা দেশ ছেড়ে বিদেশের তাঁবেদার পররাজ্যগুলির উপর শাসন-শোষণের মন্ত্রস্বরূপ ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করে এক

ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী গড়ে তোলে। এর ফলে, সমাজে দেশে একদল লোক সমারোহ প্রাচুর্যের মধ্যে বিলাস-জীবন যাপন করতে থাকে—দুঃখ-দগ্ধ অভাবক্লিষ্ট বিশ্ব মানব-গোষ্ঠীর তুলনায় যারা মুষ্টিমেয়, নগণ্য। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাকে বিদ্রূপ করে এরাই সদম্ভে আবার সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়ে দেয়—যার জন্যেই ঘনিয়ে আসে ঐ বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ।

অধর্মের অভ্যুত্থান হলেই বিধাতার আসন টলে যায়, তাঁরই ইচ্ছায় নূতন পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে ধেয়ে আসে বিপ্লব। এবারও মহাযুদ্ধের শেষের দিকে রুশ-বিপ্লবের অগ্নি-গর্ভ থেকে—ফরাসী-বিপ্লবের ফলে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মত আর এক সম্পদ দেখা দিয়েছে; এ থেকে সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এক নূতন পথ প্রকাশ পেয়েছে। জগদ্বাসীকে এরা আজ জানাচ্ছে—নিপীড়িত মানবত্মার মুক্তির আর বিলম্ব নেই, মাভৈঃ!

ইহার পর অধ্যাপকের নির্দেশে অপর ছাত্রী কৃষ্ণা দেবী প্রসঙ্গটির পরবর্তী অংশ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল: কিন্তু এরই মধ্যে প্রাচীন রুশ-সাম্রাজ্য সোভিয়েট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ধর্মকে তাঁদের এলাকা থেকে সরিয়ে দিয়ে সব-কিছু ভেঙে-পিটে এক ছাঁচে গড়তে চলেছেন, তাতে আশঙ্কা হয় যে, ফরাসী-বিপ্লবলব্ধ অমৃতকে ক্ষমতালোভীরা যেভাবে হলাহল করে তুলে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের পট-ভূমিকা রচনা করেছিল, ক্ষমতা-শালী সোভিয়েট নেতা লেনিনের পর তাঁর উত্তর-সাধকরা রুশ-বিপ্লবের সাধনালব্ধ সম্পদকেও যদি অনর্থ করে তোলে, আর অত্যাচারী জারের প্রেত তাঁদের ঘাড়ে চেপে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে—আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হব না।

এইভাবে দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক বীরমূর্তির নির্দেশ অনুসারে ছাত্রীবৃন্দ পর পর যোগ দিয়া এই ধারণাটুকু সকলের অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দিল যে, শুধুই ইহাদের

দেশ ভারতবর্ষ নহে, নিখিল বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাহারা প্রত্যেকেই জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া অভিজ্ঞার দাবী রাখে।

দেশ-নেতা লালা লাজপত রায় অবাক হইয়া ছাত্রীদের আলোচনা শুনিতেছিলেন। ভারতের নারীজাতি বিংশ শতকের এই পরিবর্তনের যুগেও গৃহ-কোণে আবদ্ধা হইয়া আছেন বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল এবং নারী-শিক্ষা ও নারী-জাতির কর্তব্যবোধ উদ্বুদ্ধ করিতে অন্যান্য নেতৃবর্গের সহিত বিশেষভাবে সচেতন থাকা সত্ত্বেও যে তাহা সার্থক হয় নাই, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহই ছিলেন। অথচ এই সভাস্থলে বিদ্যাপীঠের স্বাস্থ্যবতী বাকপটিয়সী ছাত্রীরা বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে এমন সহজ সরল সাবলীল গতিতে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন যে, পলিটিক্স বা রাজনীতির ছাত্রগণের পক্ষেও যাহা সুকঠিন। পক্ষান্তরে দেশের অধিকাংশ পুরুষের মস্তিষ্কে এই সব চিন্তার যে কোন বালাই নাই—নিজেদের দেশের দম্বন্ধেই যে তাঁহারা এখনও পর্যন্ত অন্ধকারে রহিয়াছেন, সে বিষয়েও সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। শুনিতে শুনিতে তিনি এরূপ অভিভূত ও উল্লসিত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ হইতে কন্যাদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে 'সাধু সাধু' প্রশংসাবাদ নির্গত হইল এবং পরক্ষণে প্রতিধ্বনির মত শ্রোতাদের সপ্রশংস কণ্ঠ-ধ্বনির তরঙ্গে সমগ্র মণ্ডপ মগ্ন হইয়া গেল।

অধ্যাপক বীরমূর্তি অতঃপর সারির শেষের ছাত্রী চণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ তুমি এখন বর্তমান আলোচনার সমাপ্তি কর। সোভিয়েট নেতাদের উদ্ভাবিত সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার সহপাঠিনী কৃষ্ণাদেবীর আশঙ্কার কারণ বিশ্লেষণ করে তুমি সমাধানের পথ দেখাও।

অধ্যাপক মহাশয়ের নির্দেশে চণ্ডী উঠিবামাত্র জনপূর্ণ সুবৃহৎ মণ্ডপটি মুহূর্তের জন্য আলোড়িত হইয়া উঠিল। সভারম্ভের প্রাক্কালে সুদর্শনা যে মেয়েটি অসঙ্কোচে দৃপ্তকণ্ঠে সভাসীন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির

অশিষ্টতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাহাকেই ভাষণ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া শ্রোতৃ-মহলের এই চাঞ্চল্য। প্রত্যেকেই সোজা হইয়া বসিয়া চণ্ডীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সাগ্রহে উৎকর্ণ হইলেন। বিশেষতঃ, পূর্ববর্তিনী ছাত্রী কৃষ্ণাবাঈ-এর গুরুত্বপূর্ণ উক্তির পর নূতন কি কথা এই মুখরা মেয়েটির পক্ষে বলা সম্ভব, তাহা জানিবার জন্যও অনেকেরই কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল।

মর্মর মূর্তির মত ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া চণ্ডী নিষ্পলক-নয়নে সভাস্থল লক্ষ্য করিল। তাহার পর মঞ্চাসীন সভাপতি ও অধ্যাপক এবং মণ্ডপে উপস্থিত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ অভিবাদনপূর্বক তাহার বক্তব্য আরম্ভ করিল: আমার সহপাঠিনী ভগিনী কুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণাবাঈ ওদেশের সাম্যবাদ-নীতি সম্বন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তা অমূলক নয়। কারণ, আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিত বলেই আমাদের চোখে এর গলদ চাপা থাকতে পারে না। কাজেই অন্ধভাবে ঐ নীতির অনুসরণ না করে আমাদের উচিত, ভারতীয় আদর্শে ওর দোষ-ত্রুটিগুলির বিচার করে গুণগুলিই গ্রহণ করা। আমরা জানি, মানুষের জীবন কোন কিছুকে বাদ দিয়ে নয়। শুধু একটা দিক দেখেই জীবনের ব্যাখ্যা সমাধানের পথটি বার করলে হয় ত প্রথমে সেটা বেশ মনে ধরবে, তার পরেই গলদগুলো ক্রমে ক্রমে ধরা পড়বে। এইজন্যই পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এভাবে জীবনকে দেখা আর অন্ধের হাতী দেখা—সমান বলেছিলেন। অন্ধ হাতীর কাছে আসতেই তার হাত হাতীর পায়ে পড়ল; অন্ধ ভাবল হাতী ঠিক থামের মত। আর এক অন্ধ হাতড়ে হাতড়ে হাতীর কানের নাগাল পেয়ে ধারণা করল, হাতী ঠিক কুলোর মত। একদিক দিয়ে যাঁরা জীবনকে দেখেন, তাঁরাও প্রত্যেকে এমনি ভ্রান্ত। গাছের পরিচয় যেমন তার ফলে, মানুষের পরিচয় তেমনি তার মনুষ্যত্বে। যেহেতু, স্নেহ-ভালবাসা, দয়া-মায়া শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভক্তি আনন্দ-বেদনা এইসব নিয়েই মানুষের

জীবন। ভারতবর্ষের ভূমিতেই মানবতার প্রথম বিকাশ হয়। ভারতবর্ষের ঋষিরাই প্রচার করেন—প্রাণধর্মের গতি অনুসারেই জীব বা মানুষ বাঁচতে চায়, তার জন্য চেষ্টা করে। এই ইচ্ছাকেই ভারতবর্ষের উপনিষদে প্রাণৈষণা বলা হয়েছে। এ থেকেই আসে অন্নৈষণা, যৌন-এষণা, এর পরিণতি মাতৃ এষণায়। এরই প্রেরণায় সর্বমানবের কল্যাণ কামনায় ভারতের ঋষিরা সত্য ও অহিংসার পথ-প্রদর্শন করেন। স্বাভাবিকভাবেই মানবতার সঙ্গে মানব-জীবনের প্রাণৈষণা অন্নৈষণা মাতৃ এষণার বিকাশে বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখ-শান্তি ও আনন্দের সঞ্চার হয়ে থাকে। মানুষের মধ্যে মানবতার বিকাশ ও প্রকাশ শিব সত্য সুন্দরের প্রকাশ। প্রকৃতির বাঁধা-ধরা নিয়ম-পথেই প্রকৃতির রাজ্যের শাসনব্যবস্থা চলেছে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় নেই বলেই এ-যুগের সংস্কারকামীদের মন ও দৃষ্টি সংশয়াচ্ছন্ন। মানব প্রকৃতির সব কিছু নিয়েই যেমন মানুষের জীবন, তেমনি সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, মানবতা সব কিছু নিয়ে প্রকৃতির রাজ্যও চলেছে। মানুষ সমস্ত অনৈক্যের মধ্যেই নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে ঐক্যের সন্ধান নিয়ে সামঞ্জস্য করবে—এই হচ্ছে মানুষের প্রতি বিশ্বস্রষ্টার নির্দেশ। কিন্তু সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রে এক নূতন ভাবে সামাজিক অসাম্য আমদানী করা হয়েছে, তার ফলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বেদীমূলে মনুষ্যত্বকে পিষে মানুষকে জড়পিণ্ডে পরিণত করা হচ্ছে। এখানে ভারতবর্ষের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করে জড়পিণ্ডে পরিণত করার ব্যবস্থা মানবতার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। তাই ভারতের ঋষিরা অনেক আগেই মানুষের কল্যাণের জন্য এই সমন্বয়বাদ প্রচার করেছেন। তাঁদের মতে প্রকৃতির বাঁধা ধরা নিয়মেই সমাজ ব্যবস্থা চলেছে; সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে আশ্রয় করেই তার জীবন সুস্পষ্ট আলোর দিকে চলতে বাধ্য। ওদিকে অশুভ বুদ্ধি-সৃষ্ট বিকৃত সাম্যবাদ মানুষকে আদিম-

স্তরে নিয়ে গিয়ে হিংস্র জানোয়ারে রূপান্তরিত করেই তৃপ্ত। এখন এই অগ্নি-সমুদ্র থেকে গরল মন্থন করে অমৃত আহরণ করবার সামর্থ্য রাখে একমাত্র আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। এই যে সমন্বয়বাদ—ভারত-সংস্কৃতির এটি মূলকথা। এই সংস্কৃতির নীতি হচ্ছে—পৃথিবীর যে অংশে যা ভালো ও শ্রেষ্ঠ তাকেই গ্রহণ করতে হবে—ভারতের বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়ে নয়। এই জন্যেই সর্বসংস্কৃতি-সমন্বিত ভারত-সংস্কৃতি পৃথিবীর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকেও আত্মবিকাশ ও আত্ম-প্রসারের সুযোগ দিয়ে এসেছে—কোথাও কাউকে গ্রাস বা শোষণ করে নি। ওদেশের জাতীয়তাবাদ বা সমাজবাদ জাতিকে পররাজ্য গ্রাস করতে প্রেরণা দেয়; কিন্তু ভারতের সমন্বয়পন্থী জাতীয়তা উদারভাবে পররাষ্ট্রকে আত্মবিকাশের সুযোগ দিয়ে এসেছে। এমন মহত্তর আদর্শ ভারত-সংস্কৃতি ছাড়া আর কোথাও নাই। তাই আমি বলি—এই দারুণ পরিবর্তনের মুখে সমন্বয়বাদী ভারতবর্ষ আর এক মহান সুযোগের সম্মুখীন হয়েছে। সে সুযোগের গোড়াপত্তন করেছেন বৃটিশ সরকার স্বয়ং। গত মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ অর্থে সামর্থ্যে সর্বতো-ভাবে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করায় সরকার উৎফুল্ল হয়ে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে তার পরম কাম্য স্বরাজ দান করে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেবেন। বিজয়ী সরকারের কাছ থেকে ভারতবাসী সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ দেখবার আশায় সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। এই প্রতিশ্রুতি যদি পালিত হয়, ভারতবর্ষ যদি স্বরাজ পায়, তাহলে আমরাও আশা করব যে, আমাদের নেতাদের অনুপ্রেরণায় ভারত-সংস্কৃতি এই দুর্দিনে বিশ্ব সংস্কৃতিতে পরিণত হয়ে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধন করবে। এখানে হতাশ হলে চলবে না, মনে রাখতে হবে—আমাদের সংস্কৃতির মৃত্যু নাই, সেই আমাদের রক্ষা করবে। আমাদের জাতীয় জীবনের দারুণ দুর্দিনে আমরা যখন ধনে মানে প্রাণে ধর্মে সব রকমে মরতে বসেছিলাম, সেই মরণ-মুহূর্তে আমাদিগকে বাঁচিয়ে তোলবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সামনে

অবতীর্ণ হলেন যুগমানব যুগপ্রবর্তক যুগাবতার পরম পুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁরই কাছ থেকে জাতি পেল যুগোপযোগী অপূর্ব বিধান। শোনালেন তিনি ভারত সংস্কৃতির বাণী ; জাতিকে দিলেন— সত্যের সন্ধান! সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে বিশ্বমানবের বন্ধন মুক্তির যে উপায় তিনি জানিয়ে দিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নাই। পরে তাঁরই মানসপুত্র শক্তিধর শিষ্য ভারত-কেশরী নরেন্দ্র গুরুদত্ত সেই ভারত-সংস্কৃতি ও সংহিতার সত্য বাণী ওদেশের জড়বাদী সমাজকেও শুনিয়ে চমৎকৃত করেছেন।

সেই থেকে বিশ্বের দরবারে ভারত পেয়েছে সম্মানের আসন—নরেন্দ্র হন স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্বমনীষীরা তখনি জানালেন যে, ভারতেয় মেরুদণ্ডে জোর আছে, সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগাবার সামর্থ্য রাখে একমাত্র ভারতবর্ষ। স্বামী বিবেকানন্দ জাতিকে লক্ষ্য করে বজ্রকণ্ঠে যে কথাগুলি বলেছিলেন, শুনলে এখনো রোমাঞ্চ হয়। তাঁর সেই উক্তি হচ্ছে—'ভারতের প্রত্যেক মানুষকে ডেকে বলতে হবে, তোমারও সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম রাষ্ট্রনীতি সব আছে। ওঠ, যোগ্য হও, রাষ্ট্র কর্তৃত্ব গ্রহণ কর।' পঞ্চাশ বছর আগে স্বামিজী আশার যে বাণী শুনিয়েছিলেন, তারই সম্ভাবনা আজ সূচিত হয়েছে। আগামী দিনের সেই উজ্জ্বল আশা আমাদের অন্তরে প্রেরণা যোগাবে। ভারতের ঋষিরা বলে গেছেন—আত্মানং বিদ্ধি। অর্থাৎ, আগে আপনাকে জানবার চেষ্টা কর। নিজেকে জানতে পাবলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ইংরেজীতে একে 'সেল্‌ফ-রিয়েলিজেসন' বলে। পৃথিবীতে যাঁরাই বড় হয়ে বিরাট প্রতিভার দান রেখে গেছেন, তাঁরা আগেই নিজেকে জেনেছিলেন। আজকের এই পরিবর্তনের দিনে মেয়েরাও নিজেকে জানবার চেষ্টা করুন। আমাদের শিক্ষাদাতা গুরু প্রথম থেকে এই শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন যে, আর সব কিছু চোখে দেখে জানবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মন দিয়ে যেন নিজেকে জানতে পারি। খুব শৈশবেই আমরা

শিক্ষার্থিনী হয়ে এখানে আসি—পাঁচ ছয় বছরের বেশী কারও বয়স ছিল না। বারো বছর ধরে—আমরা প্রত্যেকে বাপ মা ঘর সংসার সব ছেড়ে এই আশ্রমে আছি। এর মধ্যে জগতে কত কি হয়ে গেছে, কিন্তু আপনাকে জানতে পেরেছি বলে সারা জগতকে আমরা জেনেছি, চিনেছি। আমরা যে সব কথা বলেছি তা তোতা পাখীর মত কণ্ঠস্থ করা বুলি নয়। ইচ্ছা করলে আপনারা আমাদের এই শিক্ষার ব্যাপারে যে কোন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন।

মণ্ডপ মধ্যে একস্থানে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া কতকগুলি মহিলা বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বেশভূষা, বয়স ও ভাবভঙ্গি একই প্রকার, সম্ভবতঃ তাঁহারা কলেজের ছাত্রী, বয়স উনিশ কুড়ির মধ্যে। প্রত্যেকেই দীর্ঘাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী, রূপসী ও সুগঠনা। চণ্ডীর কথা এস্থানে শেষ হইতেই তাহাদের ভিতর হইতে একজন উঠিয়া সভাপতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল: সভাপতি মহাশয় অনুমতি দিলে আমরা ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করি।

সভাপতি বলিলেন: উনি ত নিজেই সে কথা বলিলেন—যা জিজ্ঞাস্য থাকে বলুন ?

মেয়েটি তখন চণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া শুধাইল: দেখুন, সংগোপনে আপনাদের শিক্ষার কথা শুনে আমরা ভেবেছিলাম, এতদিন ধরে শুধু আপনারা জ্ঞানার্জনের জন্য বিদ্যা শিক্ষাই করেন নি, এমন আরও অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন—যেগুলো দুর্লভ। আমরাও তেমনি প্রত্যাশা করেছিলাম; আর আপনাদের গুরুদেব সুরুতেই নাকি এমনি আভাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু কতকগুলি বক্তৃতা ছাড়া সেদিক থেকে কিছুই আমরা এখনো জানতে পারিনি; যে কোন গ্রাজুয়েট মেয়ে দেশবিদেশের খবর রাখে—সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। কাজেই, ওসব ছাড়াও আমরা কি চাইছি, সেটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন ?

চণ্ডী বেশ স্নিগ্ধ অথচ সংযত স্বরে মেয়েটির প্রশ্নের উত্তর দিল:

সোজাসুজিভাবে জানবার বিষয়টি না বললেও, আপনার কথার ধারা থেকেই বুঝতে পেরেছি, আপনারা আরো কি চাইছেন! আমাদের গুরুজী গোড়াতেই নাকি আক্ষেপ করেছিলেন—পুরুষদের ভিতর থেকে নাম করবার মত কত শক্তিধরই এযুগে আমাদের দেশে জন্মেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে উল্লেখ করবার মত ঝাঁসীর বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাঈ ছাড়া আর একটিও নাম মেয়েদের মধ্য থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আরও বলেছিলেন, ছেলেবেলা থেকে গড়ে তুললে মেয়েরাও অবলা নাম ঘুচিয়ে সবলা এবং সবদিক দিয়েই পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে। মহাশক্তি ভগবতীও নারী ছিলেন, সেই নারীত্ব প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে, শিক্ষা ও সাধনার সাহায্যে তিনি তাঁর প্রতিটি ছাত্রীকে জাগ্রতা ভগবতী করে তুলবেন। আপনার প্রশ্নও বোধ হয় এই প্রসঙ্গ নিয়ে?

মেয়েটি খুসি হইয়া উত্তর দিল: আপনি ঠিক ধরেছেন। এদিক দিয়ে আমরা ওঁর শিক্ষাদান এবং আপনাদের সাধনা সম্বন্ধে চমকাবার মত কিছুই দেখতে বা জানতে পারিনি।

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী বলিল: তার মানে, প্রথমেই মাননীয় সভাপতি মহাশয় আমাদের মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিচার না করে আমাদের দৈহিক শক্তির কসরৎ দেখতেই বেশী উদ্‌গ্রীব। কিন্তু সেটা খুব বড় কথা নয়। ঘোড়ায় চড়ে, দৌড়ঝাঁপে, লক্ষ্য ভেদ করে, সাঁতার কেটে, অস্ত্র চালিয়ে যদি আমরা আপনাদের সামনে দৈহিক শক্তির পরীক্ষা দিতাম, তাহলে আপনারাও আনন্দে করতালি দিয়া বাহোবা দিতেন কিন্তু গুরুদেবের ইচ্ছা নয় যে, সার্কাসের মেয়েদের মত সাময়িকভাবে নানারকম কসরৎ দেখিয়ে আমরা আপনাদের মনোরঞ্জন করি। তবে একথা আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি—যে কোন অন্যায় বা অপ্রিয় অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি ও সাহস প্রদর্শনের শিক্ষা আমরা পেয়েছি। সুতরাং আততায়ীর সংস্পর্শে এলে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করেই যে ভেঙ্গে পড়তে হবে, আত্মরক্ষার জন্যে আমাদের

নারীত্ব জাগ্রত হয়ে উঠবেনা— আমাদের পক্ষে এসব কল্পনারও অতীত। এখানে বহু মহিলাই উপস্থিত হয়েছেন, এবং এ সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহলই বেশী। আশা করি, তাঁরাও শক্তি সাধনায় অভ্যস্তা। এ অবস্থায় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে তাঁরা মঞ্চে এসে আমাদের দৈহিক শক্তির পরীক্ষা নিতে পারেন। আমার কথা এখানেই শেষ করে—সমবেত নরনারী প্রত্যেককে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে আপনাদের পরীক্ষার প্রতীক্ষায় রইলাম।

সমগ্র মণ্ডপ ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। যে মেয়েটি ইতিপূর্বে প্রশ্ন তুলিয়াছিল, গাঢ়স্বরে সে বলিল: আমি ঠিক বুঝতে না পেরে এভাবে আপত্তি তুলে একটা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছি—এর জন্য আমি দুঃখিত। বর্তমান ভারতের আদর্শ কন্যারূপে আপনারা ভারতনারীকে নূতন পথ দেখিয়ে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করুন।

ইহার পর সভাপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আচার্য বীরমূর্তি তাঁহার ভাষণে বলিলেন: আপনারা শুনে সন্তুষ্ট হবেন যে, ভগবতী বিদ্যাপীঠ থেকে সাধনা-সিদ্ধা এই কন্যাগুলির অধিকাংশই স্ব স্ব অঞ্চলে ফিরে নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করবেন। কতিপয় কন্যার নির্দিষ্ট বাসস্থান বা আত্মীয়স্বজন না থাকায়, তাঁরা এই আশ্রমে থেকেই এখানকার ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেবেন। সকলেই জেনেছেন, এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি স্বতন্ত্র প্রকৃতির, সুতরাং যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় থেকে কলেজী শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁরাও এখানে এসে শিক্ষার্থিনী হতে পারেন। সদ্য-উত্তীর্ণা এই পনেরোটি ছাত্রীর স্থানে উপস্থিত এই সংখ্যক ছাত্রী গ্রহণ করা হবে। এখানে অর্থের কোন প্রশ্ন নেই।

মণ্ডপ হইতে দেবীপ্রসাদ এই সময় বলিলেন: যাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে এবং শিক্ষিতা বলে আমাদের কাছে প্রতিপন্না হয়েছেন, আমি যদি তাঁদের প্রত্যেককে 'পাঞ্জাব নার্সিং হোম নামক'

আরোগ্যশালায় যোগ দিয়ে চিকিৎসা ও রোগীর পরিচর্যা হাতে-কলমে শিক্ষালাভের জন্য অনুরোধ করি, ওঁরা কি সম্মত হবেন? অবশ্য, এরূপ অনুরোধ করবার অধিকার আমার আছে। যেহেতু, আমার চাচাজী রাজা ভগবতীপ্রসাদ—যিনি ভগবতী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা—তাঁরই নির্দেশে এই সহরে বহু অর্থব্যয়ে আধুনিক পরিকল্পনায় এই আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছে এবং আমিই তার প্রেসিডেণ্ট।

অধ্যাপক বীরমূর্তি বলিলেনঃ আপনার দেশমান্য চাচাজীর নির্দেশে আপনি যে আরোগ্যশালা খুলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে চিকিৎসা ও সেবা পরিচর্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, এটিও খুব আনন্দের কথা, এবং এদিকেও দেশবাসীর যথেষ্ট অভাব আছে। কিন্তু বিদ্যাপীঠের ভগবতীরা অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে এ শিক্ষায়ও পারদর্শিনী হয়েছেন। ইচ্ছা হয়ত, একটা দিন স্থির ক'রে এদের দু'চার জনকে আপনার আরোগ্যশালায় নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। দেশের বিচক্ষণ চিকিৎসকদের কাছেই এরা হাতে-কলমে এই বিদ্যাটিও শিখেছেন।

সভাপতি লাজপত রায় অতঃপর তাঁহার ভাষণে অধ্যাপক বীরমূর্তি, তাঁহার প্রবর্তিত সুসম্পূর্ণ স্ত্রী-শিক্ষা-পদ্ধতি এবং ভগবতী বিদ্যাপীঠ হইতে পরীক্ষাসিদ্ধা পনেরটি ছাত্রীর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করিলেন, ইঁহাদের শিক্ষা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র উপনিষদ যে মুক্তি-মন্ত্র বিশ্বের জন্য রেখে দিয়েছেন, এঁরা শিক্ষা-জীবনে তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছেন—

বিদ্যাং চা বিদ্যাং চ যসতদ্ বেদোঽভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতম্ অশ্নুতে॥

যিনি জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়ই অনুষ্ঠেয় বলে জানেন, তিনি কর্মের দ্বারা মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়ে বিদ্যার দ্বারা অমৃত আস্বাদন করেন। বিদ্যাপীঠের এই বিদুষী মহিলাগুলি প্রত্যেকেই জ্ঞানে কর্মে

দক্ষতা লাভ করেছেন। এঁদের শুভ প্রচেষ্টায় আমাদের দেশ জ্ঞানে কর্মে উন্নত হয়ে বিশ্বসভায় সম্মানিত আসন লাভ করুক। ভারত-বাসীর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ লাভ হলেই এখানকার উচ্চ আদর্শে আমরাও স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করব এবং সে সময় অধ্যাপক বীরমূর্তির পরামর্শ ও সহায়তা বিশেষ কার্যকরী হবে।' উপসংহারে সভাপতি কন্যাদের সম্পর্কে ধৈর্যশীল অভিভাবকবৃন্দকে ধন্যবাদ দিয়ে অন্যান্য অভিভাবকগণকে তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। এখানকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি বলিলেন—'অভিভাবক উদার না হলে সন্তানগণের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা সর্বতোভাবে সম্ভব হয় না।'

তুমুল উল্লাসধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হইল এবং ভগবতী বিদ্যাপাঠ সম্বন্ধে বহুদিনের একটা সমস্যার এইভাবে সমাধান হওয়ায় বিশাল মণ্ডপে সমবেত পুরুষ ও মহিলাগণ সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর তাঁহারা স্বেচ্ছাসেবিকাগণের সহায়তায় সারিবদ্ধভাবে ধীরে ধীরে মণ্ডপ ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পাঞ্জাব নার্সিং হোমের সেবিকাদের লইয়া ডাক্তার গৃহিণী দক্ষিণাদেবী সভামণ্ডপে মহিলাদের সারিতে বরাবর উপবিষ্টা ছিলেন। সভার প্রারম্ভে স্বামীর আপত্তিকর ব্যবহারটিও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। আধুনিক বেশভূষায় সজ্জিতা নার্সিং হোমের তরুণীরাও সে সময় মুখের চাপা হাসি লুকাইতে পারে নাই। দক্ষিণাদেবী তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন, কুমার সাহেবের সহিত তাঁহার স্বামীর পরিকল্পিত নার্সিং হোমটি বর্তমানে জনসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত না হইলেও, ভগবতী বিদ্যাপীঠের বিদূষী তরুণীদের সহযোগে তাহার ভাগ্যোদয় হইতে পারে। কিন্তু বিদ্যা-পীঠের বিদুষীরা তাহাদের সর্বতোমুখী দক্ষতার যে পরিচয় দিয়াছে সর্বসমক্ষে, তাহাতে তাহাদের সহযোগিতা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় কুমার সাহেবের উৎসাহ কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহাই এখন রীতিমত চিন্তার বিষয়। বিদ্যাপীঠের সভা ভঙ্গের পর

নার্সিং হোমের তরুণীদের লইয়া বাসায় ফিরিবার সময় এই চিন্তা ডাক্তার-গৃহিণীর চিত্তাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

॥ পাঁচ ॥

কুমার সাহেব এদিন ডাক্তার ছাড়াও অনেকগুলি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত বিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভার পর কুমার সাহেব সকলকে লইয়া তাঁর বাসভবনের ড্রয়িং রুমে আলোচনা করতে বসলেন। পরিচারকগণও প্রস্তুত ছিল, উৎকৃষ্ট পানীয় এবং উচ্চাঙ্গের খাদ্য প্রত্যেকের সম্মুখে উপস্থিত করিল। ভোজনের সঙ্গে আলোচনা চলিল। ডাক্তার বিহারীলাল ব্যতীত যে কয়জন অন্তরঙ্গ যুবাকে কুমার সাহেবের সঙ্গে মেলামেশা করিতে দেখা যায়, তাঁহার ড্রয়িং রুমে পান ভোজনে ও মজলিসের মাইফেলে যোগ দেন, তাঁহাদিগকে পারিষদ বা মোসাহেব শ্রেণীর ইয়ার-বক্সি সাব্যস্ত করিলে ভুল করা হইবে। ইঁহারাও অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান—এক সময় কুমার সাহেবের সহপাঠী ছিলেন। এখন অকৃতদার পরিজনবিহীন স্বজাতীয় সুহৃদটিকে প্রকৃতপক্ষেই শুভার্থী হিতৈষীরূপে দেখা শোনা করিয়া থাকেন। কুমার সাহেবও বৈঠকখানার মজলিসে কিম্বা ভোজের টেবিলে ইঁহাদিগকে পাইলে পরম পুলকিত হন, তাঁহার আমোদ-প্রমোদ এবং পান ভোজনের আয়োজন সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া উল্লসিত হইয়া উঠেন। কুমার সাহেবের উক্ত উদারতা খুবই পরিচিত কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

বন্ধু সম্পৎলাল বলিলেন : প্রফেসরজী যে পনেরোটি লেড়কীকে তৈরী করে তাদের হিম্মত দেখালেন, আমার হাতে যদি ও-গুলোকে ছেড়ে দেন, আমি সম্বৎসরের মধ্যে তামাম হিন্দুস্থানের শেঠজীদের তহবিল সব লুটে আনতে পারি।

হরদয়াল নামে আর এক বন্ধু মুখ ও চোখের বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া কহিলেন ঃ প্রফেসরজী নিজেই যে ঐ খুবসুরত লেড়কী রপলিটন নিয়ে সফরে বেরুবেন না—তাই বা কে বলতে পারে ?

কুমার সাহেব ঈষৎ ক্ষুব্ধ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ প্রফেসর বীরমূর্তি আর তাঁর ছাত্রীদের উপলক্ষ করে এভাবে তোমাদের আলোচনার অর্থ ?

বিষাণজী নামে কুমার সাহেবের আর এক বন্ধু এই প্রশ্নটির পীঠে খপ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন ঃ অর্থ বুঝতে পারছ না কুমার সাহেব—ভগবতী বিদ্যাপীঠের বিদূষীদের বিদ্যা আর রূপের জলুস যাদের চোখের ওপর পড়েছে, তারাই তাজ্জব বনে গেছে ; জানে যে ওখানে নাগাল পাবার বা আড্ডা জমাবার কোন সুযোগ-সুবিধাত নেই, তাই মনগড়া কথা বলে কুমার সাহেবের দিলের খবরটা জানতে চাইছে।

আগের দুই বন্ধু বিষাণজীর কথার আঘাতে কিঞ্চিৎ ব্যথা পাইয়া উন্মুখ হইয়া উঠিলেন এবং তন্মধ্যে সম্পৎলাল শ্লেষের সুরে বলিলেন ঃ বিষাণজী যে আজকাল জ্যোতিষীর পেশা ধরেছে, সেটা আমাদের জানা ছিল না। আমরা দুই বন্ধু খোলাখুলি ভাবেই কথা বলেছি। কুমার সাহেবের দিলের খবর নেবার জন্যে আমরা উল্টো পথে যাব কেন—চোখের সামনেই ত দেখছি !

গম্ভীর মুখে কুমার সাহেব বলিলেন ঃ কুমার সাহেবকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন—নিজেদের দিনের খবর বল, আমরা শুনি।

চতুর্থ বন্ধু ইন্দ্রনারায়ণ সহাস্যে মন্তব্য করিলেন ঃ আসল কথা হোচ্ছে কুমার সাহেব, দিল আমরা সবাই হারিয়ে ফেলে এসেছি। যে নয়া দুনিয়ার দরওয়াজা আমাদের সামনে খুলে গিয়েছে, আর সেখানে আমরা যে সব নয়া চীজ দেখেছি, প্রত্যেকের দিল ভরে গেছে—কিছুদিন আর কোন ব্যাপারেই মন বসবে না। ডাক্তার সাব কি বল ?

নিবিষ্ট মনেই ডাক্তার বন্ধুদের প্রত্যেকের কথা শুনিতেছিলেন ; ইন্দ্রনারায়ণের প্রশ্ন শুনিয়া উপেক্ষার ভাবেই তিনি বলিলেন : আপনারা রইস মানুষ, যথেষ্ট অবসর, ভাবনাচিন্তার বালাই নেই, ওসব বিলাস আপনাদেরই সাজে ; আমরা হচ্ছি নাড়ি-ধরা ডাক্তার, মানুষের জ্যান্ত ও মরা দেহ নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, চেহারা দেখে দেখে অরুচি হয়ে গেছে, কাজেই ডাক্তার সাহেবকে আর আপনাদের মধ্যে টানবেন না।

বন্ধুদের মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ রীতিমত স্পষ্ট বক্তা। ডাক্তারের কথার উত্তরে তিনি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলিলেন : ডাক্তার সাহেবের কথাগুলো বিড়ালতপস্বীর মতন শোনাল! নারীদেহ দেখে দেখে ঘেঁটে ঘেঁটে অরুচি হয়েছে বলেই বুঝি বিদ্যাপীঠের মেয়েগুলো মঞ্চের ওপরে দাঁড়াতেই খোলা চোখে দেখে মন ভরেনি—দূরবীণ ক'ষে লোক হাসিয়েছিলেন ?

বিষাণজী বলিলেন : সম্পৎলালজী আমাকে জ্যোতিষী ব'লে ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু আমি জ্যোতিষীর মতই বলছি সবার সামনে—ভগবতী বিদ্যাপীঠের যে মেয়েগুলিকে ডাক্তার সাহেব হেনস্তা করলেন, শীগ্‌গীরই আমরা দেখতে পাব—স্টেথিসকোপ শিকেয় তুলে ওদের পিছনেই উনি ছুটোছুটি করছেন।

বিষাণজীর কথাটা বিশেষ উপভোগ্য হওয়ায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। কুমার সাহেব বলিলেন : আবার ডাক্তার বেচারীকে নিয়ে পড়লে হে !

বিষাণজী বলিলেন : কুমার সাহেব ডাক্তারকে যতই আগলে রাখতে চেষ্টা করুন, উনি নিজেই বে-টপকা এগিয়ে ধরা দেবেনই।

ইন্দ্রনারায়ণ এই সময় বলিলেন : এখন আসল কথায় আসা যাক—তোমরা ত ভাই জানো, আমার চোখের দৃষ্টি আলাদা। আর এখানে বাইরের কেউ নেই যে রেখে ঢেকে বলব ! আমাদের

কুমার সাহেব বিয়ে করেন নি এখনো—যদিও বিয়ের বয়স ওঁর পার হয়ে গেছে। বিয়ে না করবার কারণ হচ্ছে, ওঁর যে রকম উচু দরের পছন্দ, তেমন মেয়ে পান নি, আর পাওয়া যাবেনা বলেই ওঁর ধারণা ছিল। কিন্তু ভগবতী বিছাপীঠের মেয়েরা ওঁর সে ধারণা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এখন বুঝতেই পারছ—কুমার সাহেবের ধারণা যখন ভেঙে গেছে, ওঁর কামনা পূর্ণ করা চাই, আর—সেটি হোচ্ছে আমাদেরই কর্তব্য।

বক্রী তিন বন্ধু ইন্দ্রনারায়ণের কথা শুনিয়াই উল্লাসের সুরে 'বাহে বাহে' শব্দের ঝঙ্কার তুলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে বিষাণজী বলিলেন ঃ তবে কাজটি খুব সহজ নয়। এখন আরও একটি কঠিন প্রশ্ন হোচ্ছে—বিছাপীঠের কোন্ কন্যাটি কুমার সাহেবের মনে ধরেছে? কোন্ ভাগ্যবতীকে তিনি—

ইন্দ্রনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন ঃ বৃথাই তোমাকে জ্যোতিষী বলা হয়েছে বিষাণজী! গণনার কথা ছেড়ে দিই, মানুষের সহজ দৃষ্টিতেও তুমি কি দেখনি কিছুই? কুমার সাহেবের এখন যে অবস্থা, তাতে বিছাপীঠের পনেরটি বিদুষীই যদি একসঙ্গে ওঁর গলায় মালা দিতে চান, উনি কাউকে হতাশ করবেন না; তবে সেই যে-মেয়েটি প্রথমেই ডাক্তার সাহেবের ওপর একহাত নেয়, সেইটিই ওঁর দিলখানা নেড়ে দিয়েছে। বাংলা দেশের 'চণ্ডী' নামে ঐ মেয়েটিকেই উনি মনে মনে পছন্দ করেছেন।

বন্ধুগণ আর একবার সমস্বরে 'বাহে বাহে' ধ্বনি তুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ তাহারই মধ্যে ডাক্তারের নির্বাক বিবর্ণ মুখখানার দিকে অপাঙ্গে একটিবার চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন ঃ তোমার কি ব্যাপার ডাক্তার? সাড়া নেই মুখে, ভঙ্গিটাও ভাবময়; হলো কি? তবে কি তুমিও চণ্ডীদেবীকে—

কুমার সাহেব তৎক্ষণাৎ বন্ধুর কথায় বাধা দিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন ঃ ছি, ছি, বলছ কি তোমরা? ঠাট্টারও একটা সীমা আছে

তা জান ? ডাক্তার বিবাহিত—সে কথা কি ভুলে গেছ ? সে ভদ্র-মহিলা যদি তোমাদের কথা শুনতে পান—

ইন্দ্রনারায়ণ জিহ্বাটি বাহির করিয়া দন্তপাটি দ্বারা চাপিয়া তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিলেন। পরক্ষণে ডাক্তারের কাছেও ক্ষমা চাহিয়া ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু এই ডাক্তারটির বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য ভেদ করিবার মত অন্তর্দৃষ্টি কুমার সাহেবেরও ছিল না—ডাক্তার তাঁহার অতবড় অন্তরঙ্গ সুহৃদ হইলেও। বিদ্যাপীঠের কন্যাগুলির প্রত্যেকটির বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য-সম্মত মনোজ্ঞ রূপ অনবদ্য হইলেও, সভার সূচনায় যে মেয়েটি সর্ব-সমক্ষে ডাক্তারকে অপ্রতিভ করিয়া দেয়, তাহার সেই তেজোময়ী রূপটি তদবধি ডাক্তারের সমগ্র চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে, কুমার সাহেব তাহা কেমন করিয়া জানিবেন ? তবে প্রীতিভোজের এই সবান্ধব আসরে ইহাই অবশেষে সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, কুমার সাহেব এতদিন যৌবনের একাংশ একাই সগৌরবে অতিক্রম করিয়া মধ্যভাগে সহসা নারীর রূপে আকৃষ্ট ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের এখন প্রধান কর্তব্য তাঁহার এই প্রচ্ছন্ন অভিলাষটি সার্থক করিয়া তোলা।

অতঃপর সেই ভোজের মধ্যেই স্থির হইয়া গেল যে, ভগবতী বিদ্যাপীঠের কন্যাগুলির সহিত অধ্যাপক বীরমূর্তিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার উদ্দেশ্যে কুমার সাহেব সবান্ধব উদ্যোগী হইয়া বিশেষ সমারোহের সহিত পাঞ্জাব নার্সিং হোমে সম্পূর্ণ নূতন ধরণে এক উৎসবের আয়োজন করিবেন এবং সেই উৎসবেই একটা বুঝাপড়া করা যাইবে।

কুমার সাহেব বলিলেন : আমাদের আরোগ্যালয়ের পরিচালিকা সেবিকাদের সঙ্গে নিয়ে ত বিদ্যাপীঠের সভায় গিয়েছিলেন, এখন তাঁরা কি ধারণা নিয়ে ফিরেছেন, সেটা জেনে রাখা আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য।

কুমার সাহেবের কথাটার সমর্থন সকলেই করিলেন। নার্সিং-হোমের পরিচালিকা মিসেস বি, এল, বি, অর্থাৎ দক্ষিণা দেবী সাধারণতঃ নার্স বা সেবিকাদিগকে লইয়া ভিতরে থাকিলেও প্রয়োজন পড়িলে কুমার সাহেবের আলোচনার মজলিসে অসঙ্কোচে যোগ দিয়া থাকেন। সে সময়ে তাঁর ড্রয়িং রুমের পাশেই একখানি ঘরে আরোগ্যালয় সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে বৈঠক বসে। কুমার সাহেবের আহ্বান পাইয়াই দক্ষিণা দেবী সেবিকাগুলির ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া পাঁচটি মেয়েকে সঙ্গে লইলেন। এখানে আসিয়া অবধি তিনি কুমার সাহেব ও তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত বিশেষভাবে পরিচিতা হইয়াছেন ; সুতরাং অসঙ্কোচেই আলোচনা চলিয়া থাকে।

কিন্তু আরোগ্যালয়ের যে পাঁচটি সেবিকাকে তিনি সঙ্গে করিয়া আনেন, সরাসরি আলোচনা-গৃহে না আনিয়া কুমার সাহেবের ব্লকের ওয়েটিংরুমে তাহাদিগকে অপেক্ষা করিবার নির্দেশ দিয়া আলোচনা কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

আলোচনা গৃহে আসন গ্রহণ করিবার পর কুমার সাহেবকে দক্ষিণা দেবী শুধাইলেন : বিদ্যাপীঠের বিদূষীগুলিকে কেমন দেখলেন, কি বুঝলেন, আর কি স্থির করলেন—জানতে পারি ?

গম্ভীর মুখে কুমার সাহেব বলিলেন : কঠিন প্রশ্ন ! আমরাই ঠিক এই প্রশ্নগুলি করব বলেই আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আহ্বান করে এনেছি। কিন্তু আপনিই প্রথমে প্রশ্ন তুলে আমাকে মুস্কিলে ফেললেন।

দক্ষিণা দেবী বলিলেন : মুস্কিল বলছেন কেন ? আমার চোখের উপরেই এখানকার প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সুরু হয়েছে। সাজানো গোছানো, নার্স আনা, রোগীদের বেডের ব্যবস্থা, নিয়ম-কানুন সবই হয়েছে, আর গোটা দুই তিন মাসের মধ্যেই। কিন্তু বিদ্যাপীঠের বিদূষীরা তৈরী হয়েছেন একনাগাড়ে বারোটি বছর ধরে। তারপর একটা দিন স্থির করে, পাবলিকের সামনে তাঁরা দাঁড়ালেন,

শোনালেন কতকগুলো মুখস্থ করা কথা—পৃথিবীর কোথায় কি হয়েছে, এখনকার কি অবস্থা—এই সব। আপনিই কুমার সাহেব, ঐ বিদুষীদের আপনার নার্সিং হোমে আনিয়ে চিকিৎসা-বিদ্যাটিও শিক্ষা নেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন ; ওটা খুবই সঙ্গত আর সাময়িক হলেও, ওঁদের অধ্যাপক তখনি আপত্তির ভঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, এ বিদ্যাটিও ওঁরা প্রত্যেকে শিখেছেন। এমন কি, পরীক্ষা দিতেও প্রস্তুত আছেন—একথাও ওঁদের অধ্যাপক তখন বলেছিলেন। আমার গোড়া থেকেই একটা আশা ছিল, মেয়েগুলি শিক্ষিতা ও সংস্কারমুক্ত হয়েছে যদি দেখি, ওঁদের সাহায্যে আপনার চাচাজীর এই কীর্তি-মন্দিরটিকেও জাঁকিয়ে তুলব। কিন্তু আমি এখন এই বুঝেছি কুমারসাহেব, ওঁরা হয়ত আমাদের সঙ্গে মেশবার জন্য এগিয়ে আসবেন না। এখন আপনারা কি বুঝেছেন বলুন, তারপর কর্তব্য সম্বন্ধে স্থির করা যাবে।

কুমারসাহেব কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তারপর গম্ভীরভাবে বলিলেন : দেখুন, খুবই মনোযোগ দিয়ে আমি বিদ্যাপীঠের মেয়ে-গুলির আলোচনা শুনেছি। এখানে অস্বীকার করব না যে, ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে আমার কিছু পড়াশুনা আছে, দেশের খবরও আমি রাখি, অন্ততঃ খবরের কাগজগুলি বরাবর পড়ে থাকি। এদিক দিয়ে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে কখনই বলতে পারব না যে, মেয়েগুলির বিদ্যা, শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা—প্রতিটি ধার-করা, অর্থাৎ অধ্যাপকের নোট মুখস্থ করা কৃতিত্ব মাত্র। যিনি যখনই বলতে উঠেছেন, তখনই তাঁর মুখে চোখে এমন একটা ভঙ্গি ফুটে উঠেছে যে, দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। যে কথাগুলি বলছেন, অন্তরের সঙ্গে তার যোগ না থাকলে ও-ভাবে মুখ চোখের ভঙ্গি হয় না। কাজেই আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না।

ডাক্তার-গৃহিণী কুমার সাহেবকে যতখানি চিনিয়াছিলেন, সেই অনুপাতে এইভাবে অনুমান চিকিৎসা করিতে গিয়া অপ্রস্তুত

হইলেন। কুমার সাহেব যে গভীরভাবে মনোযোগ দিয়া বিদ্যাপীঠের কন্যাদের আলোচনা শুনিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সতর্ক হইতে হইল। কিন্তু সহজে নিজের ভ্রম স্বীকার না করিয়া তিনি সংযত কণ্ঠেই বলিলেন: দেখুন কুমার সাহেব, মানুষের মুখের কথা শুনে—বিশেষ করে সে কথা যদি বক্তৃতা বা কোন কিছুর আলোচনা-সূত্রে হয়, তা থেকে বক্তা বা বক্তৃর আসল প্রকৃতি ধরা যায় না। তারপর, মেয়েদের সম্বন্ধে আমরা—মেয়েরা যতখানি বুঝব, আপনাদের পক্ষে ততখানি বুঝতে পারা সম্ভব না হতেও পারে।

ইন্দ্রনারায়ণ এই সময় সহসা প্রশ্ন করিলেন: আপনি তাহলে বিদ্যাপীঠ দেখে কি বুঝেছেন? ধরুন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি বিদ্যাপীঠের পাল্লা দেবার কথা ওঠে—

দক্ষিণা দেবী বলিলেন: ও-চেষ্টা এখন করতে যাওয়া আহাম্মুখী ছাড়া আর কিছু নয়। ওখানকার অধ্যাপকটির রুচি, দৃষ্টি, সৌন্দর্য-জ্ঞান প্রত্যেকটি দেখেছেন ত কেমন নিখুঁত। আর, মাপ করবেন—আপনারা লাহোরে গিয়ে সেখানে রীতিমত টাকা ঢেলে যে সব নার্স এনেছেন, তাতে আপনাদের পছন্দকে কেউ ভালো বলবে না। কিন্তু আমার মনে হয়, বিদ্যাপীঠের যে পনেরটি মেয়েকে আমরা সেদিন দেখেছি, ওখানকার অধ্যাপক গোড়া থেকেই ওদের প্রত্যেককে কষ্টি-পাথরে সোনা ঘষে দেখবার মত করে সবদিক দিয়ে যাচাই করে বিদ্যাপীঠে এনেছিলেন। এখন বিদ্যাপীঠ দেখে আমার মনে বরং এই দুশ্চিন্তা হয়েছে—আপনাদের উৎসাহ না ভেঙ্গে পড়ে।

কুমার সাহেব শক্ত হইয়া বলিলেন: ও চিন্তা আপনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন। অবশ্যি, বিদ্যাপীঠ দেখার পর আমাদের নার্সিং হোমকে খুবই ছোট আর সিদ্ধির দিক দিয়ে এখন ব্যর্থ মনে হবে, কিন্তু তা'বলে এর হাল আমাদের ছাড়া হবে না—আমরা একে সার্থক করে তুলবই। এখন আর একটি ব্যাপারে আপনার অভিমত জানতে চাইছি, যেহেতু সেটি আপনারই জুরিসডিকসনের মধ্যে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দক্ষিণা দেবা কুমার সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ক্ষণকাল, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই শব্দের অভাব পূর্ণ করল। কুমার সাহেব বলিলেন : দেখুন, বিদ্যাপীঠের ঐ মেয়েগুলিকে এবং ওদের সঙ্গে ওখানে পড়াশুনা করছে এমন আরো কতকগুলি ছাত্রীকে যদি এখানকার হোমে যোগ দিতে রাজী করাতে পারি, সে সম্বন্ধে আপনার কি মত? আপনি সমর্থন করবেন?

নীরবে একটু চিন্তার পর দক্ষিণা দেবী বলিলেন : না। আপনাদের এ কাজ কোন দিক দিয়েই সমর্থনযোগ্য নয়।

সবান্ধব কুমার সাহেব স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া রহিলেন ডাক্তার গৃহিনীর আপত্তিমূলক কথাটা শুনিয়া।

এতক্ষণ পরে এই প্রথম ডাক্তার বি, এল, বি, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন : সমর্থনযোগ্য নয় কেন? আমরা সকলে বসে মাথা ঘামিয়ে যে প্রস্তাবটি সঙ্গত ও সময়োপযোগী ভেবে গ্রহণ করেছি, তুমি বলতে চাও সেটা সমর্থনযোগ্য নয়?

বন্ধুরা অনুরোধ করলেন : আপনার এতে আপত্তি কেন, সেটা অন্তত বুঝিয়ে দিন।

কুমার সাহেব বলিলেন : দেখুন, বিদ্যাপীঠের মেয়েগুলিকে এখানে এনে এখানকার আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। অথচ, ঐ বিভাগটির পরিচালিকারূপে আপনার সিদ্ধান্তও অগ্রাহ্য করা যায় না। আপনাকে এখন বলতে হবে দক্ষিণা দেবী, বিদ্যাপীঠের মেয়েদের এখানে আনতে আপনার আপত্তির কারণ কি? আর সেটি খণ্ডন করা কি কঠিন?

দক্ষিণা দেবী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একটু পরে আস্তে আস্তে বলিলেন : দেখুন কুমার সাহেব, আমার প্রথম কথা হোচ্ছে—সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। একথার মানে বোধ হয় বুঝেছেন—ভালো করে না জেনে আগে থেকে যে কাজ খুব সহজে হাসিল করা যাবে বলে ভাবা যায়, পরে সেটা অসাধ্য হয়ে ওঠে।

বারো বছর ধরে যিনি সেকালের তপোবনের ঋষিদের মত মন ও সামর্থ্য নিয়ে মেয়েগুলিকে তৈরী করেছেন দেশের নারীজাতির আদর্শ করে, আপনারা আগে থেকেই এঁচে বসে আছেন—নিজেদের প্রতিষ্ঠানে আনবার প্রস্তাব তুলে তাদের প্রত্যেককে ধন্য করে দেবেন। আশ্চর্য এই যে, বিদ্যাপীঠের সভায় উপস্থিত থেকে, তাদের মতিগতি জেনেও আপনারা মত পরিবর্তন করেন নি! কেন নিজেরাই উঠে পড়ে লাগুন না—মনের মতন করে ছাত্রী তৈরী করবার জন্য। তাতে আনন্দ পাবেন, আর বাইরের লোকও সুখ্যাতি করবে।

দক্ষিণা দেবীর কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই কুমার সাহেব ডাক্তারের দিকে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে তাকাইতেছিলেন। কথা শেষ হইতেই জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেনঃ শুনলে হে ডাক্তার, ইনি ত আমাদের নিরাশ করে দিচ্ছেন। আর, যে-সব কথা বললেন—তার পিছনে যুক্তিও আছে।

অপ্রসন্ন মুখে রুক্ষস্বরে ডাক্তার বলিলেনঃ প্রফেসর বীরমুর্তি নিজের মতলবে বেপরোয়া হোয়ে বিদ্যাপীঠের কাজে লেগেছিলেন বলেই, কাজটা ইচ্ছামত হাসিল করতে পেরেছিলেন। কিন্তু যদি কোন নারীর পরামর্শ তাঁকে নিতে হোত,—কখনই বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠত না। আমার মনে হয় কুমার সাহেব, টাকা থাকলে, আর ঠিকমত তাকে খাটাতে পারলে বুদ্ধি খেলিয়ে, কোন কাজই অসিদ্ধ থাকে না।

ইন্দ্রনারায়ণ সহাস্যে বলিলেনঃ তাহলে এঁদের দুজনের মধ্যে মতের গরমিল হচ্ছে; এ অবস্থায় কুমার সাহেব কাষ্টিং ভোট দিয়ে বরং—

রীতিমত শক্ত হইয়া দক্ষিণা দেবী বলিলেনঃ দেখুন, এসব ঠাট্টার কথা নয়—একটা জটিল সমস্যার মধ্যেই আমরা পড়িছি। আমার কথা যদি আপনাদের মনে না ধরে, আপনারা যা স্থির করেছেন, দেখুন না—যদি সার্থক করে তুলতে পারেন। আমার

সঙ্গে মতে মিলছে না বলে যে সহযোগিতা করব না আপনাদের কাজে—এমন কথা ভাববেন না।

কুমার সাহেব দক্ষিণা দেবীর কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তখন দুইদিক সামলাইবার অভিপ্রায়ে অত্যন্ত কোমলকণ্ঠে বলিলেন: আপনার কথা শুনে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারছি; আমাদের উদ্দেশ্যটি আপনি বুঝেছেন বলেই, আপনার মতের সঙ্গে না মিললেও সহানুভূতি জানালেন স্পষ্টভাবেই। আমরা একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই, বিদ্যাপীঠের কিছুসংখ্যক মেয়েকেও যাতে এখানে আনতে পারি। আর সেটা যদি সম্ভব হয়, আপনি বরাবরই এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠার দিকে চেয়ে—

কথাটা শেষ করিতে যাহা বলা প্রয়োজন, কুমার সাহেব বোধহয় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিভাবে প্রসঙ্গটি সমাপ্ত করিবেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী দক্ষিণা দেবী বক্তার সঙ্কল্পটি উপলব্ধি করিয়া নিজেই বলিতে বাধ্য হইালেন: আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন কুমার সাহেব, আমার আপত্তি সত্ত্বেও আপনারা ও-ব্যাপারে হাত দিয়ে যদি আশার আলো দেখতে পান, আমার মতবিরুদ্ধ বলে বাধা তো দেবই না, বরং আপনাদের চেষ্টা যাতে সার্থক হয়—সেই চেষ্টাই করব আন্তরিকতার সঙ্গে।

কুমার সাহেব উৎফুল্ল মুখে ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ডাক্তার, শুনছ?

কুমার সাহেবের বন্ধুরাও কৌতুকোচ্ছল দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাইলেন। কিন্তু কুমারের ইঙ্গিতে ডাক্তার-জায়ার সমক্ষে সমস্বরে উল্লাসকর শব্দের ঝঙ্কার তোলা এক্ষেত্রে অশোভন বুঝিয়া সংযতভাবে নীরব রহিলেন। কুমার সাহেব অতঃপর ডাক্তারকে ছাড়িয়া তাঁহার সহধর্মিণীকে বলিলেন: দেখুন, মতবিরুদ্ধ হলেও আপনি যখন আন্তরিকতার সঙ্গে সাহায্য করতে রাজী হলেন, আমাদের পক্ষে এটা খুবই আনন্দের কথা। এখন একটা কথা হোচ্ছে, বিদ্যাপীঠের সঙ্গে

প্রাথমিক আলোচনাটা কিভাবে চালানো যাবে? আপনি তো জানেন, আমাদের প্রস্তাবটি অধ্যাপক বীরমূর্তি গ্রহণ করেন নি, তার উত্তরে পাল্টা প্রস্তাব করেন যে, ওখানেই ওঁর ছাত্রীরা প্রত্যেকেই চিকিৎসা বিদ্যাটাও শিখেছেন, ইচ্ছা করলে আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। ওঁর এই কথাটাকেই উপলক্ষ্য করে আমরা যদি এখানে সেই রকম ব্যবস্থা করি—

দক্ষিণা দেবী বলিলেন: অর্থাৎ উনি বলেছিলেন বলেই আপনারা মেয়েগুলিকে এখানে আনিয়ে প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষা করতে চান— চিকিৎসা বিদ্যায় ওঁরা অভিজ্ঞা কিনা? কিন্তু আমার মনে হয়, এটা খুবই মামুলি ব্যবস্থা, তাছাড়া সাধারণ ভদ্রতারও বিরোধী। অন্ততঃ, আপনার পক্ষে কিছুতেই উচিৎ নয়। কেন, এর চেয়ে অনেক সোজা আর সহজ উপায় তো রয়েছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া কুমার সাহেব বলিলেন: কি রকম?

দক্ষিণা দেবী বলিলেন: দেখুন কুমার সাহেব, আপনার চাচাজী ছিলেন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা, সেদিক দিয়ে বিদ্যাপীঠের সভায় আপনার অনেক কর্তব্য ছিল, কিন্তু করা হয় নি। যাই হোক, আপনিই এখন সবার আগে উদ্যোগী হয়ে তাঁরই ইপ্সিত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও ছাত্রীদের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করুণ। এ থেকেই আপনার উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হবে, ওঁরা এখানকার ব্যবস্থা দেখবার সুযোগ পাবেন। একবার আলাপ পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা হোলে তখন সুযোগ সুবিধা বুঝে আসল প্রস্তাব তুলতে আর বাধবে না।

প্রস্তাবটি কুমার সাহেবের আবেগ-চঞ্চল চিত্তটিকে এমনই অভিভূত করিল যে, আনন্দে কিছুক্ষণ তাঁহার কণ্ঠ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। বন্ধুদের সমবেত কণ্ঠের উল্লাসধ্বনি তাঁহার স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিল। তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন: খাসা প্রস্তাব।

কুমার সাহেব ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: শুনলে তো

ডাক্তার। আর তুমি কিনা একটু আগেই মেয়েদের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর কটাক্ষ করছিলে! ইন্দ্রনারায়ণ রহস্য করিয়া বলিলেনঃ ইংরাজীতে একটা কথা আছে Greatmen think alike. এখানে আমাদের কুমার সাহেবের মাথা থেকেও—

কুমার সাহেব তৎক্ষণাৎ বন্ধুর কথায় বাধা দিয়া এবং ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেনঃ না, না, আমাদের কারও মাথায় এ মতলব আসেনি! আপনিই আমাদের যুক্তিপথে নতুন আলো দেখালেন। এই সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বেশ জাঁক জমকের সঙ্গে ওঁদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করব।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, দক্ষিণা দেবীর সহিত নার্সিং হোমের পাঁচটি মেয়ে আসিলেও তাহাদিগকে কুমার সাহেবের ওয়েটিংরুমে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল। এই সময় তাহাদিগকে পরামর্শ কক্ষে উপস্থিত করা হইলে দক্ষিণা দেবী সস্নেহে প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ কুমার সাহেব কি বলছেন শোনো—অনেক কাজের ভার তোমাদের উপর পড়েছে।

বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহারা চাহিয়া রহিল। কুমার সাহেব বলিলেনঃ ভগবতী বিদ্যাপীঠের কন্যারা আমাদের নার্সিং হোম দেখতে আসবেন। তোমাদের সঙ্গে তাদের আলাপ-পরিচয় হবে। তোমরা এঁরই কাছে জানতে পারবে, সেদিন তোমাদের কি কি কাজ করতে হবে, কি রকম সাজ-গোজ করবে। তোমরাও চেষ্টা করবে ওদের মতন সব দিক দিয়ে চৌখস যাতে হোতে পার।

মেয়েগুলি সবিনয়ে মাথা নত করিয়া কুমার সাহেবের কথা সমর্থন করিল। এখানেই সেদিনের মত মজলিস ভঙ্গ হইল।

॥ ছয় ॥

বিদ্যাপীঠের বিস্তীর্ণ পাঠাগারে অধ্যাপক বীরমূর্তি ছাত্রীদিগকে লইয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। প্রাতরাশের পর প্রত্যহ এখানে এই অপূর্ব সমাবেশ হইয়া থাকে। সুদীর্ঘ টেবিল-খানির তিন দিকে সারিবদ্ধ কেদারায় উপবিষ্টা ছাত্রীবৃন্দ, তাহাদের পুরোভাগে সমাসীন ঋষিকল্প অধ্যাপক। ইঁহার সহিত সচ্ছন্দভাবে নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া ছাত্রীরা আনন্দ পায় ও জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদ বাড়ায়। বলা বাহুল্য, যে পনেরটি ছাত্রী সেদিন সর্বসমক্ষে তাহাদের সাংস্কৃতিক প্রতিভার পরীক্ষা দিয়া সগৌরবে উত্তীর্ণা হইয়াছিল এদিনও তাহারাই অধ্যাপককে প্রায় পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল।

অধ্যাপক বলিতেছিলেন : তোমাদের শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হয়েছে, অভিভাবকদের কাছে প্রতিশ্রুতিমত আমি প্রত্যেককে পৌঁছে দিতে বাধ্য। অবশ্য, বিধাতার ব্যবস্থায় বা দুর্ঘটনায় যাই বল, তোমাদের মধ্যে তিনটি ভগবতীর ফেরবার স্থান ও পরিজনের অভাব ঘটায়, তাদের সম্বন্ধে ব্যস্ততার কিছু নেই। ইচ্ছা করলে তারা জন্মস্থানেও যেতে পারে, কিন্তু অধ্যাপিকারূপে বিদ্যাপীঠেই গৌরবের সঙ্গে থাকবার দাবীও তাদের আছে। তাদের অভিপ্রায় মতই ব্যবস্থা করতে আমি বাধ্য।

ইহার পরেই সেই তিনটি কন্যা প্রায় একই সঙ্গে উঠিয়া অধ্যাপককে অভিবাদন করিল এবং একে একে প্রত্যেকেই জানাইল, তাহারা স্থানীয় অধ্যাপক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে থাকিতে চায়। তিনিই যখন বলিয়াছেন, শিক্ষার শেষ নাই, সেক্ষেত্রে আরও কিছুদিন তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়া জ্ঞান ও বিদ্যার পুঁজি বাড়াইয়া লইবে।

অধ্যাপক বীরমূর্তি প্রসন্ন মনে বলিলেন : তাহা হইলে বিদ্যাপীঠের

অধ্যাপিকা রূপেই তোমরা এখানে গৌরবের সঙ্গে থাকবে এবং বিদ্যাপীঠ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তিরও ব্যবস্থা করবে। আর শিক্ষালাভ, সে তো এখানকার পরিবেশের অঙ্গ। যতদিন আমি আছি, তোমাদের জ্ঞানের পিপাসা মেটাবার জন্য আহ্বান পেলে নিজেকেই আমি ধন্য মনে করব।

ছাত্রীদের মধ্যে যাহাদের গৃহ পরিজন ও অভিভাবকবর্গ বিদ্যমান তাঁহারাও জানাইল যে, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে এই বিদ্যাপীঠে বসবাস করায় তাহাদের প্রত্যেকেরই ইহার প্রতি এমন একটা মায়া পড়িয়া গিয়েছে যে, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবার জন্য কোন আগ্রহই তাহাদের নাই। যদিও তাহারা স্ব স্ব গৃহে পিতা, মাতা এবং অন্যান্য পরিজনবর্গকেও পত্রযোগে তাহাদের সাফল্যের সংবাদ দিয়াছে—তবে এখনই গৃহে রওনা হইবে, এমন কথা কেহ লিখে নাই; তাহাদের আশঙ্কা, হয় ত স্থানীয় পরিবেশের সহিত তাহারা আপনাদিগকে মানাইয়া চলিতে পারিবে না, এখানকার শিক্ষায় তাহাদের চিত্তাকাশে জ্ঞানের যে আলোকপাত হইয়াছে, সে আলোর আভা হয়ত সেখানে অনেকেরই অসহ্য হইবে। সুতরাং আরও কিছুদিন এখানে থাকিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব মাতৃভূমির খবর লইতে হইবে। আর, একান্তই যদি যাইতে হয়, সে ব্যবস্থা তাহারাই করিয়া লইবে; গুরুজীকে সেজন্য উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া গুরুজী যখন তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তখন তাহারা এরূপ পারদর্শিনী হইয়াছে যে, একা একা সমগ্র বিশ্ব পর্যটনেও নির্ভয়ে বাহির হইবার সামর্থ্য রাখে।

অধ্যাপক বলিলেনঃ তোমাদের মনোভাব জেনে আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছি। এতদিন তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করবার অবসরই আমার ঘটেনি। কেবল এক-একবার মনে হতো, এখানে এই যে বৃহৎ সংসারটি পেতেছি, তোমরাই আমার প্রধান অবলম্বন, কিন্তু তোমরা কৃতবিদ্য হয়ে চলে গেলে আমার

অবস্থা কি হবে ? পরবর্তিনীরা অবশ্য তোমাদের জায়গায় এগিয়ে আসবে ; কিন্তু তা হলেও দীর্ঘ বারো বছর ধরে তোমাদের সঙ্গ, সাহচর্য, সমাযোগ আমাকে বুঝি নিজের সত্তাও ভুলিয়ে দিয়েছে ; এ অবস্থায় তোমাদের অভাব আমার জীবনেও একটি রীতিমত দোলা না দিয়ে পারে না ! এখন তোমাদের অভিসন্ধির কথা আপাত-মধুর মনে হলেও, নানা কারণে আমার পক্ষে সমর্থনও অনুচিত। আদর্শ নারীর শিক্ষা তোমরা পেয়েছ, কিন্তু মনে রেখো, তোমাদেরও কর্তব্য আছে। জন্মভূমির মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় পিছিয়ে আছে জেনে, তোমরা সেখানে খাপ-খাওয়াতে পারবে না ভেবে, জন্মভূমির মায়াও কাটাতে চাইছ। কিন্তু সেটা কি ঠিক ? চাণক্য পণ্ডিত বলে গেছেন—'একশ্চন্দ্র তমোহন্তিঃ ন চ তারা সহস্রসঃ।' আমাদের ইচ্ছা তো তোমরা জানো—প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঞ্চলে এক একটি চন্দ্রের মত ফুঠে উঠে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে দেবে। তোমাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সাড়া পড়ে যাবে। অবশ্য, জন্মভূমির মত এখানকার শিক্ষাভূমিও তোমাদের মনে যে মায়ার সঞ্চার করেছে, কাটিয়ে যাওয়াও কঠিন। কাজেই, সেজন্য প্রস্তুত হতে থাক, মনকে দৃঢ় কর। মায়ার মোহে আবদ্ধ হয়ে থাকবার পাত্রী তোমরা নও। ডাক এলেই পা বাড়াতে হবে। আমার ধারণা, চলার পথে কখনই তোমাদের পদস্খলন হবে না।

একবাক্যে সকলেই পূজনীয় গুরুজীর কথায় সম্মতি জানাইয়া তাঁহার অমোঘ আশীর্বাদের উপর আস্থা স্থাপন করিল। গুরুবাক্যে তাহাদের প্রত্যেকের মনে এই ধারণা দৃঢ় হইয়া গেল, পিছিল পথে চলিবার শিক্ষা, শক্তি ও কৌশল গুরুর কৃপাতেই তাহারা জানিয়াছে, সুতরাং তাহাদের পা পিছলাইবার কোন ভয় নাই।

কিছুক্ষণ পরে গুরুজী চণ্ডীকে উদ্দেশ করিয়া অন্যান্য ছাত্রীদিগকে বলিলেন ঃ তোমরা সবাই জানো যে, তোমাদের সহপাঠিনী চণ্ডীর

সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে এবং প্রায় একই অঞ্চল আমাদের জন্মভূমি। মানুষ মাত্রেরই জন্মভূমির সম্বন্ধে কর্তব্য আছে। শাস্ত্রকারগণ তাই ব্যবস্থা দিয়েছেন, জাতক যেখানেই থাকুক, বারো বৎসর পূর্ণ হবার মুখে জন্মভূমির মাটীতে মাথা ঠেকানো উচিত! তোমাদের অবস্থা কি হয় দেখে তারপর এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হবে।

এখানে এইভাবে আলোচনার সময় একখানি ফিটন গাড়ী বিদ্যাপীঠের ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই পরিচারক ছুটিয়া আসিয়া গতিরোধ করিল। তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে কুমার সাহেব তাঁহার কার্ডখানি পরিচারকের হাতে দিয়া বলিলেন: অধ্যাপক বীরমূর্তিজীকে দাও, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

গাড়ীর চালককে অপেক্ষা করিতে বলিয়া কার্ড লইয়া সে ব্যক্তি পাঠাগারে প্রবেশ করিল। অধ্যাপক কার্ডে ছাপা নামটি পড়িয়া আগন্তুকদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য পরিচারককে আদেশ করিলেন। সে চলিয়া গেলে তিনি বলিলেন: এখানকার নার্সিং হোমএর ডাক্তারকে নিয়ে তার প্রতিষ্ঠাতা কুমার সাহেব আসছেন। ওঁরা যে এখানে আসবেন, তাঁর নার্সিং হোমে যে তোমাদের ডাক পড়বে, আমি তা জানতাম।

কৃষ্ণা নামে একটি ছাত্রী বলিল: চণ্ডীর মনস্কামনা তাহলে পূর্ণ হবে।

অধ্যাপক: কেন?

কৃষ্ণা: চণ্ডীর মতে সেদিন ঐ ডাক্তারটিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়নি। আরও কিছু বেশী করে শুনিয়ে দেবার ওর ইচ্ছা ছিল।

অধ্যাপক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চণ্ডীর দিকে তাকাইবা মাত্র সে বলিল: হ্যাঁ দাদু, কৃষ্ণা ঠিকই বলেছে। আপনিও অনেকবার বলেছেন—আমার চোখের দৃষ্টির এমন একটি শক্তি আছে, মানুষের প্রকৃতি নাকি তা থেকে জানা যায়। আমিও অন্ততঃ মানুষকে

চেনবার চেষ্টা করি। সেদিন সভায় ঐ লোকটিকে অশিষ্ট ব্যবহার করতে দেখে প্রথমে প্রতিবাদ করি; কিন্তু তারপর ওর মূর্তি দেখি—তাতে শিউরে উঠি। মানব-জীবনের কল্যাণসাধক চিকিৎসকে সাত্ত্বিক আকৃতির কোন অংশই ওর মধ্যে খুঁজে পাইনি। সত্যই দাদু, ঐ লোকটার সঙ্গে বোঝা-পড়ার ইচ্ছাটিকে আমি এখনো সংযত করতে পারি নি। এখন ভাবছি, আমার ইচ্ছাশক্তিই হয়ত তাকে এখানে টেনে আনছে!

অধ্যাপক কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন: কিন্তু ভুলে যেওনা যেন—এখানে তিনি অভ্যাগত হয়েই আসছেন।

বসুন্ধরা ভার্গব এই কথার পর সাগ্রহে বলিল: ওঁরা তো এখানে আমাদের চিকিৎসা-বিদ্যার পরীক্ষা করতে আসছেন না দাদু? আপনিই কিন্তু বলেছিলেন—ইচ্ছা করলে ওঁরা আমাদের নার্সিং বিদ্যার পরীক্ষা করতে পারেন! তা যদি হয় দাদু, চণ্ডীকেই এগিয়ে দেবেন—বিষে বিষক্ষয় হবে।

চণ্ডী মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল: তোমার যেমন ধারণা! সেদিনের অভদ্রতা আমরা যাতে ভুলে গিয়ে বাহোবা দিই—এমন কোন মতলব নিয়ে ওঁদের শুভাগমন হচ্ছে। দাদু যখন নিষেধ করেছেন, বোঝাপড়া এখানে করতে যাব না; তবে যদি নিজে থেকে ইট-টি ছোড়েন, পাটকেল ফেলে জবাব দিতে কিন্তু কার্পণ্য করাও হবে না। এ হচ্ছে দাদুরই শিক্ষা, না বলতে পারবেন না।

অধ্যাপক ব্যস্তভাবে বললেন: এ প্রসঙ্গ বন্ধ কর—ওঁরা আসছেন।

টেবিলের যেদিকে অধ্যাপকের বসিবার স্থান, তাঁহার ব্যবস্থামত সেদিকে সব সময়ই কয়েকখানি কেদারা থাকে। আলোচনাকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শুভাগমন হইলে তাঁহারা এইস্থানেই আসন গ্রহণ করিবেন—আসন আনাইবার জন্য আর তাড়াহুড়া করিতে হইবে না। এই পাঠাগারেই বর্তমানে অধ্যাপক বিদ্যাপীঠের কৃতবিদ্য ছাত্রীদের

সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া থাকেন এবং তৎকালে বহিরাগত ব্যক্তিরা দর্শনপ্রার্থী হইলে এইস্থানেই তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হয়।

কুমার সাহেব ও ডাক্তার বি, এল্, বি কক্ষমধ্যে আসিবামাত্র ছাত্রীদের সহিত অধ্যাপক স্ব স্ব আসন হইতে উঠিয়া উভয়কে অভ্যর্থনা করিলেন। অধ্যাপক স্বয়ং শ্রদ্ধার সহিত তুইখানি কেদারায় তাঁহাদিগকে পাশাপাশি বসাইয়া তাহার পর স্বয়ং আসন গ্রহণ করিলেন। পনেরটি ছাত্রীও এই সময় তাহাদের সংযুক্ত কর-পল্লব মুক্ত করিয়া পূর্ববৎ স্ব স্ব স্থানে বসিল।

কুমার সাহেব ও ডাক্তার উভয়েই বিস্তীর্ণ ঘরখানির দেওয়ালের দিকে আবদ্ধ আলমারিগুলির মধ্যে সজ্জিত গ্রন্থরাজির সমারোহ-সমাবেশ এবং তাঁহাদের সম্মুখবর্তী দীর্ঘ টেবিলখানার তিনদিকে বিদ্যাপীঠের বিদূষীদের সুশৃঙ্খল অবস্থিতি দেখিয়া যে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁদের মুখের প্রসন্নতা দৃষ্টে বুঝা গেল। কুমার সাহেব প্রথমে কক্ষের সুগভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন ঃ একখানা কেতাবে পড়েছিলাম, ভাল ভাবে সাজিয়ে রাখলে বইকেই শ্রেষ্ঠ গৃহসজ্জা বলা যায়। আপনাদের পাঠাগারে বইয়ের সমারোহ দেখে কথাটা মনে পড়ে গেল।

অধ্যাপক সহাস্যে বলিলেন ঃ সংস্কৃতির দিক দিয়ে যাঁরা রুচিশীল, বইকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে স্বীকার করবেনই। ওদেশের একজন বিখ্যাত মনীষী বলেছিলেন—হাজার টাকার কতকগুলো নোট ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখবার চেয়ে, ভালো ছবি রাখলে যেমন ঘরের শোভা বাড়ে, তেমনি দামী দামী আসবাব পত্রের জায়গায় ভালো ভালো বইগুলি আলমারিতে সাজিয়ে রাখলে ঘরের সৌন্দর্য অনেক বেশী খোলে।

ডাক্তার উভয়ের সংলাপ শুনিতে শুনিতেই ছাত্রীগুলির মনোভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই সময় তিনি সহসা বলিয়া ফেলিলেন ঃ

কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষের দেহ এবং মনের সঙ্গে যেগুলির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ—সকল মানুষের জীবনের উপর যাদের প্রভাব পড়ে, চিকিৎসা জগতের সেই বস্তুগুলি যদি ঘরে সাজিয়ে রাখা যায়, তাহলে ঘরের সৌন্দর্য আরো ভালো ভাবে ফুটে উঠে—বইয়ের চেয়েও।

অধ্যাপক ডাক্তারের কথাগুলি শুনিয়া ছাত্রীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তোমরা কি বল?

ছাত্রীরা প্রায় সকলেই চণ্ডীকে বলিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে সে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে ডাক্তারের কথার উত্তর দিল : তাহলে পড়বার ঘরখানাকে ডিসপেন্সারি কিংবা হাসপাতালের ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট-রুমে দাঁড় করালেই ত হয়! কিন্তু সবার চোখে কি সেটা ভালো লাগবে? ধরুন, এই ঘর থেকে বইয়ের আলমারিগুলো সরিয়ে দিয়ে, যদি কতকগুলো স্টেথিসস্কোপ, ফোরসেপ, ইন্‌জেকসান-টিউব, প্রেসার-ওয়েট ও মেজারমেণ্টের যন্ত্রপাতি, সার্জারীর ছুরি কাঁচি, তার ওপর ডি-সেক্সান রুমের মড়ার মাথা, কঙ্কাল, হাড় বের করা হাত পা, চোয়াল এ-সব সাজিয়ে রাখা যায়, তাতে ঘরের সৌন্দর্য ফুটে উঠবে কিম্বা ভয়ঙ্কর হবে সেটাও ভেবে দেখতে হবে।

সহজভাবে কথাগুলি চণ্ডী বলিলেও তাহার বলিবার ভঙ্গিতে ছাত্রীরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসিটা এখানে অশোভন হইলেও সূচনা থেকেই এই ডাক্তরটির প্রতি তাহাদের বিরাগ বশতঃ এমন একটা কৌতুকাবহ বিষয়বস্তুকে কেহই উপেক্ষা করিতে পারিল না।

ডাক্তার আড়চোখের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রথমেই চণ্ডীকে বিদ্ধ করিয়া সেই সঙ্গে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত হাস্যময়ী ছাত্রীগুলিকে দেখিয়া লইলেন। অধ্যাপক ব্যাপারটি সামলাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে বলিলেন : গৃহস্বামী নিজের প্রকৃতি অনুসারেই যদি গৃহসজ্জার ব্যবস্থা করেন, সেজন্য কটাক্ষ করা ঠিক নয়। কোন যোদ্ধা তাঁর গৃহসজ্জায় যদি নানাদেশীয় অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, শিরস্ত্রাণ

প্রভৃতি ব্যবহার করেন, আমরা কি তাঁর রুচির প্রশংসা করব না বলতে চাও? সঙ্গীতজ্ঞদের বেহালা, তানপুরা, সরোদ, বীণা— এমনি কত রকমের বাদ্যযন্ত্রই দেখতে পাবে। এগুলোও সংস্কৃতি এবং গৃহসজ্জার অঙ্গ।

চণ্ডী বলিলঃ এ কথাও খুব সত্য গুরুজী। কিন্তু কুমার সাহেব গোড়াতে বই-এর কথাই তুলে বলেছিলেন—এইটিই শ্রেষ্ঠ গৃহ সজ্জা। ডাক্তার সাহেবই প্রসঙ্গটা অন্যদিকে নিয়ে যান।

ডাক্তার এই সময় ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেনঃ তাহলে ভাববেন না যেন—বই-এর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, ডাক্তারী বিদ্যার মত বিশ্বসাহিত্য নিয়েও আমাকে রীতিমত সাধনা করতে হয়েছে।

কথাটা শুনিবামাত্র চণ্ডী উন্মুখ হইয়া উঠিল—বিশ্বসাহিত্যের ব্যাপারে ডাক্তারটির বিদ্যার পরিচয় লইবার উদ্দেশ্যে; কিন্তু কুমার সাহেব তৎপূর্বেই ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেনঃ ইনি বিদেশেই উচ্চ-শিক্ষা পেয়েছেন, অনেকদিন প্র্যাকটিসও করেছিলেন বিলাতে। অল্পদিন হলো দেশের আকর্ষণে সস্ত্রীক ফিরে আসেন। সেই সময় খবর পেয়ে আমি ওঁদের দুজনকেই পাকড়াও করে আমার চাচাজীর নার্সিং হোমের ভার দিয়েছি। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রীও খুব বিদুষী মহিলা এবং চিকিৎসা বিদ্যাটাও ভাল করে শিখেছেন। চাচাজীর দুটো বড় বাসনা ছিল; প্রথমটা হোচ্ছে, দেশের মেয়েদের সুশিক্ষা দিয়ে তৈরী করে তোলা, যেটা আপনি এখানে সার্থক করেছেন। দ্বিতীয়টি হোচ্ছে, এমন একটা আরোগ্যালয় এই সহরে খোলা হবে—দেশের মেয়েরা স্ত্রীরোগ এবং প্রসবের সময় যেখানে নিজের বাড়ীর মত তোয়াজে, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও সুপ্রসবের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাবেন। দুটো প্রতিষ্ঠানই খোলা হয়েছে, কিন্তু চাচাজীর দেখা হলো না—এ দুঃখ আমাদের কম নয়।

বীরমূর্তি সমবেদনার সহিত বলিলেনঃ নিশ্চয়। সরদারজী আজ

বেঁচে থাকলে আমাদের চেষ্টার সবই সার্থক হোত। আপনিও যে, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে আরোগ্যালয় খুলেছেন, খুব আনন্দের কথা। এতদিন আমি এদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাইরের আর কোনদিকে নজর দিতে পারিনি। সেদিনই আপনার প্রতিষ্ঠানের কথা প্রথম শুনি। আপনার চাচাজীর সদ্‌গুণগুলি আপনি পেয়েছেন। মেয়েদের জন্য আরোগ্যশালা খুলেছেন ; বিত্থাপীঠের উদ্বোধন দিনেও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সরদারজীর পুত্র পার্বতীপ্রসাদ এসব ব্যাপারে নীরব—বিত্থাপীঠের আমন্ত্রণেও সাড়া দেননি। তাঁকে পেলে আরও আনান্দত হতাম আমরা।

কুমার সাহেব বলিলেন ঃ সে বরাবরই লাজুক, পূজা পাঠ আর জমিদারী নিয়েই ব্যস্ত থাকে। জলন্ধরের বাইরে কোন ব্যাপারেই কেউ তাকে কখনো নিয়ে যেতে পারেনি। পাছে অমৃতসরে আসতে হয়, সেজন্য নিজের হিস্যায় জলন্ধরের সমস্ত সম্পত্তিই নিয়ে, বাইরের সব কিছু আমাকে ছেড়ে দিয়ে দেশেই মৌজ করছে। সেই জন্যই তো অধ্যাপকজীর সঙ্গে আমি হাত মিলাতে এসেছি।

বীরমূর্তি সহাস্যে বলিলেন ঃ খুব আনন্দের কথা। আপনাকে পেয়ে আমি অত্যন্ত খুসি হয়েছি। আর দেখুন, আমার দিন আখিরি হয়ে এসেছে ; এর পর আপনাকেই এসব ব্যাপারে মাথা দিয়ে দাঁড়াতে হবে।

কুমার সাহেব বেদনার সুরে বলিলেন ঃ ও কি বলছেন আপনি অধ্যাপক সাহেব, আপনার দিন এরই মধ্যে আখিরি হোতে পারে না, আপনাকে এখনো অনেক কাজ করতে হবে। এই যে কন্যাগুলি এত যত্নে এতদিনের চেষ্টায় তৈরী করলেন, এদেরও গতিমুক্তির ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে।

বীরমূর্তি কণ্ঠে জোর দিয়া বলিলেন ঃ এরা যেভাবে তৈরী হয়েছে কুমার সাহেব, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেবার সামর্থ্য রাখে, আমাকে ওদের জন্য সুপারিশ করে কিছুই করতে হবে না।

—এদের শিক্ষা যখন শেষ হয়েছে, এর পর কি করবেন এঁরা? কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করবেন—কোথায় থাকবেন?

—যিনি যেখান থেকে এসেছেন, ডাক এলেই সেখানে চলে যাবেন। এঁদের নূতন কর্মক্ষেত্র সেইখানেই গড়ে উঠবে। তবে গুটি তিনেক মেয়েকে বিদ্যাপীঠে থেকেই বোধ হয় অধ্যাপিকার কাজ করতে হবে। তার কারণ, যেখান থেকে শৈশবে এসেছিলেন, সেখানকার সম্বন্ধ সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ডাক্তার এই সময় বলিলেনঃ আপনি সেদিন বলছিলেন যে, এঁরা চিকিৎসাবিদ্যায়ও পারদর্শিনী হয়েছেন। তাহলে কুমার সাহেবের আরোগ্য-ভবনের জন্য যখন এ রকম মেয়েদের প্রয়োজন রয়েছে, আর ভালো রকমেই তাঁদের প্রোভাইড করা হবে, এঁদের ভিতর থেকে তো কেউ কেউ সচ্ছন্দে ওখানে যোগ দিতে পারেন—বিশেষতঃ সেখানে যখন অভিভাবিকার মতনই একজন অভিজ্ঞা মহিলা থাকেন?

বীরমূর্তি বলিলেনঃ ওভাবে কাজ নিতে ওদের মধ্যে কারও যদি আগ্রহ থাকে, সচ্ছন্দেই ওখানে যেতে পারেন। ওঁদের ইচ্ছার উপর হাত দিতে আমি কিছুমাত্র ইচ্ছুক নই। আপনারা আলোচনা করে দেখতে পারেন।

বিদ্যাপীঠের উদ্বোধন দিবসে এই সম্পর্কে অধ্যাপকের সহিত যে কথাবার্তা হয়েছিল, তাহা ইঁহাদের পক্ষে আশাপ্রদ হয় নাই! আজিকার অভিমত ইঁহাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল মনে হওয়ায় উভয়েই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। অতঃপর কুমার সাহেব বলিলেনঃ বেশ, আপনি যখন অনুমতি করলেন, আমরা এ সম্বন্ধে চেষ্টার ত্রুটি করব না। এঁদের ভিতর থেকে কাউকে যদি নিয়ে যেতে পারি, আর ওখানকার ব্যবস্থা দেখে খুসি হয়ে যোগ দেন, তাহলে আপনার সহায়তায়ও আমরা বঞ্চিত হবনা বলেই মনে করি। যাক্, এ সম্বন্ধে আলোচনা পরে হবে। উপস্থিত আমরা একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি

আপনার কাছে। আগেই এটা তোলা উচিত ছিল, কিন্তু কথায় কথায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। এখন কথা হচ্ছে দাদু, আপনি সেদিন শিক্ষাদান সম্বন্ধে যে আদর্শ দেখিয়েছেন, ছাত্রীগুলিকে সব দিকেই যেভাবে এগিয়ে দিয়েছেন, তাতে সকলেই হতচকিত হয়ে গিয়েছেন ; এ অবস্থায় আমারও কর্তব্য, পাঞ্জাব নার্সিং হোমের তরফ থেকে ঐ পনেরটি আদর্শ ছাত্রীর সঙ্গে আপনাকেও সম্বর্দ্ধনা করা। এখন আমাদের এই প্রার্থনা আপনাকে রাখতে হবে। আপনার সম্মতি পেলেই আমরা দিন স্থির করব।

প্রস্তাবটি শুনিয়া অধ্যাপক বীরমুর্তি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ! কুমার সাহেব ও ডাক্তারের মুখমণ্ডল তীক্ষ্নদৃষ্টিতে কথা-প্রসঙ্গে তিনি বার বার দেখিয়াও মনে শান্তি পান নাই। অথচ ইঁহারা বিদ্যাপীঠের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে আসিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে দেবীপ্রসাদের চাচাজীর কথাও মনে পড়িয়াছে—তাঁহারই পরিকল্পিত উক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকরূপে এই প্রস্তাবটি তিনি আনিয়াছেন। এ অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অধ্যাপক বীরমুর্তিকে সম্মতি দিতে হইল। কুমার সাহেব ও ডাক্তার অতঃপর উভয়েই উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে পরিবেষ্টিত কন্যাগুলির সহিত অধ্যাপককে প্রশস্তি বাচনে অভিনন্দিত করিয়া বিদায় লইলেন।

পাঠাগার হইতে ইঁহারা নিষ্ক্রান্ত হইলেই চণ্ডী তাড়াতাড়ি বলিল ঃ সেদিন অমন শক্ত হয়ে জবাব দিলেন দাদু, শুনেই ওদের মুখ দু'খানা চুণ হয়ে গিয়েছিল ; আর, আজ সহজেই ওঁরা কাজ বাগিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি কিন্তু এখনো বলছি দাদু, ওঁরা লোক ভালো নন—মুখে মনে এক নয়। আমি জেনেছি, ওঁদের নার্সিং হোম সহরের লোকজনদের সহানুভূতি পায়নি। কুমার সাহেবকে অনেকে পছন্দ করেন না—ওঁর চাচাজী প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও। তারপর ঐ ডাক্তারটি নাকি ভীষণ সুবিধাবাদী, কুমার

সাহেবকে শিখণ্ডীর মতন সামনে রেখে উনি নিজের কাজ বাগিয়ে নেন। ওঁর ওপরেও কেউ তুষ্ট নন।

বীরমূর্তি বলিলেন ঃ তুমি দেখছি এরই মধ্যে ওঁদের সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করে ফেলেছ। আচ্ছা, আমি যে ওঁদের সম্বন্ধে এতটা নরম হয়েছি, তার কারণ শুধু কৃতজ্ঞতার স্মৃতি। যে মহাপুরুষের জন্য এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, কুমার সাহেব তাঁর ভ্রাতষ্পুত্র। ওঁরই উপর তিনি ঐ আরোগ্যালয় খোলবার ভার দিয়ে যান—একথা শোনবার পর আমি ওঁদের প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে পারিনি। তারপর সম্বর্দ্ধনার প্রস্তাবটিও ভাববার মত। যদিও আমরা এর কোন প্রত্যাশা করি না, কিন্তু কেউ সম্বর্দ্ধনা করতে ইচ্ছুক, একথা শোনার পর আপত্তি তোলাও সঙ্গত নয়,। যাই হোক, তোমরাও প্রস্তুত হোতে থাক ; শীঘ্রই নার্সিং হোম, তথা আরোগ্য-ভবন থেকে আহ্বান আসছে, এটা ভেবে আমাদের আজকের আলোচনাও এখানে শেষ করা গেল।

॥ সাত ॥

কুমার সাহেব তাঁহার নার্সিং হোমের পিছনে টাকা ঢালিতে কিছুমাত্র কৃপণতা করেন নাই। মূল্যবান আসবাবপত্র, দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য যন্ত্রপাতির সমন্বয়, রোগীদের সাধারণ হলে সারি সারি শয্যা—উপরে শুভ্র সদ্যধৌত আস্তরণ, নানা প্রকার ঔষধ, সুবেশধারিনী নার্স বা সেবিকা প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল নাই, অভাব শুধু রোগীর। তাই, সম্বর্দ্ধনার দিন ধার্যের পর কুমার সাহেব ডাক্তারকে লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন—এখন কি করা যায়? বৃদ্ধ বীরমূর্তির সেই তরুণী ও চপলা ছাত্রীগুলো শুধু কি সম্বর্দ্ধনায় সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবেন? আর, যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন, তাঁহারা যদি প্রতিষ্ঠানটির ভিতরকার ব্যবস্থা দেখিতে চান? আর

কিছু না দেখাইয়া বিদ্যাপীঠের বিদুষীগুলিকে কেমন করিয়া জব্দ করিবেন? তাহাদের সেদিনের হাসির তীক্ষ্ণ সুর এখনও যে সূচের মত ইঁহাদের কানে বিধিয়া আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিল, কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। শেষে ডাক্তার বলিলেন: সবই পারা যায়, কুমার সাহেব যদি মোটা অঙ্কের একখানা চেক ছাড়েন।

বিরক্তভাবেই কুমার সাহেব বলিলেন: টাকা ছাড়তে কি আমি কোনদিন পিছিয়েছি—যে এ কথা বলছ? যদি নার্সিং হোমের মুখ রক্ষা করতে পার কোন রকমে, টাকার কোন পরোয়া নেই।

ডাক্তার বলিলেন: কিন্তু শুধু টাকায় হবে না, লোক চাই। সেই সঙ্গে চাই বাহন, অর্থাৎ গাড়ী আর পালকী—অন্ততঃ ডজনখানেক করে।

কুমার সাহেব বলিলেন: তারও অভাব হবে না। যা যা চাইছ সবই পাবে। কিন্তু মুখ আমার রাখা চাই।

ডাক্তার ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিলেন: প্ল্যানটা আজ করে ফেলি, কাল সকালেই শুনবেন। সেই সঙ্গে কাজও সুরু করা যাবে।

এখানকার বৈঠক হইতে ডাক্তার নিজের বাসায় গিয়া স্ত্রী দক্ষিণা দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। বলিলেন: ওঁদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করে, কুমার সাহেব ত এখন ভেবেই অস্থির। কি এখন করা যায়?

ডাক্তার আর ভূমিকা না করিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। মান আর মুখ রক্ষার জন্য টাকা তিনি ঢালতে রাজী আছেন, গাড়ী পাল্কী লোকজন যেমন দরকার, সে সবও পাওয়া যাবে।

একটু ভাবিয়া এবং স্বামীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দক্ষিণা দেবী তিক্তস্বরে বলিলেন: তোমার সয়তানী মতলবটা বুঝেছি। টাকার জোরে দিনকে রাত করতে চাও—

ডাক্তার সবিস্ময়ে শুধাইলেন: এ-কথার মানে?

দক্ষিণা দেবী উত্তর দিলেন: আলাদিনের যাদুবিদ্যার খেল্

দেখিয়ে সবার চোখে তাক লাগাতে চাও। উঃ, তোমার মাথায় এত সব কুমতলবও—

বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন: চুপ্—যা বুঝেছ, মনে ছিপি এঁটে রাখ।

দক্ষিণা দেবী বলিলেন: সেই যে মাথায় ঢুকেছে, বিদ্যাপীঠের মেয়েদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তবে ছাড়বে, সে ঝোঁক আর যাচ্ছে না। তোমার আসল মতলব আর কেউ না বুঝুক, আমাকে কুমার সাহেবের মত বুদ্ধু বানাতে পারবে না।

ব্যগ্রভাবে ডাক্তার বলিলেন: চুপ—আর নয়, ওখানেই ইতি কর।

দক্ষিণা দেবী এবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন: একটা কথা বলছি, মনে রেখো—ভূত ছাড়াতে গিয়ে শেষে ভূতেই না ঘাড়ে চেপে বসে।

উপেক্ষার সুরে ডাক্তার বলিলেন: সে ভয় নেই।

তথাপি দক্ষিণা দেবী গম্ভীর মুখে বলিলেন: কিন্তু আমার ভয় হোচ্ছে শেষে না স্বখাতসলিলে—

ডাক্তার পূর্ববৎ উপেক্ষার ভঙ্গিতে বলিলেন: তাহলে অনেক আগেই তলিয়ে যেতাম—বি, এল, বি হোয়ে রাজগী করতাম না এখানে। এখন এ ব্যাপারে তুমি আমার সহায় হও।

স্থির দৃষ্টি ডাক্তারের উদ্বিগ্ন মুখের উপর কিছুক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া দক্ষিণা দেবী বলিলেন: সহায় আমাকে হোতেই হবে, যখন এখানে চাকরী নিয়েছি। বুদ্ধি তুমি খেলিয়েছ ভাল। কিন্তু আমার কেবলই কি মনে হোচ্ছে জানো—স্বামিজীর সেই মোক্ষম কথাটা—চালাকির দ্বারা বড় কাজ কিছু হয় না।

ডাক্তার ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন: স্বামিজীর ঐ কথাটা আমি ঘুরিয়ে দেব জেনো—চালাকির চালেই আমি সব মাত করব।

শান্তকণ্ঠে দক্ষিণা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন: প্ল্যানটা কি তাহলে ছ'কে ফেলা হয়েছে?

গম্ভীর মুখে ডাক্তার উত্তর করিলেনঃ না, মাথার মধ্যেই ঘুরছে, এখন বলে ফেলি—শোন।

অতঃপর ডাক্তার মৃদুস্বরে তাঁহার নার্সিং হোম সংক্রান্ত পরিকল্পনাটি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই ঘটনার পর সাতদিনের মধ্যেই ভগবতী বিদ্যাপীঠের প্রধান অধ্যাপক ও পূর্বোক্তা কৃতবিদ্য ছাত্রীদের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে পাঞ্জাব নার্সিং হোম বা আরোগ্যালয়ের সুসজ্জিত বিশাল হল ঘরে উৎসবের আয়োজন অনুষ্ঠিত হইল। আসনের সংখ্যার সহিত সংযোগ না রাখিয়াই অধিক সংখ্যক ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন। গোড়া হইতেই কুমার সাহেব ও ডাক্তার বি, এল, বি সম্বর্দ্ধনার বিধি ব্যবস্থা রচনা করিলেও, দক্ষিণা দেবী বিশেষ একটি ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিলেন। যেমন—কার্যসূচীতে প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছিল, কুমার সাহেব ও ডাক্তার আমন্ত্রিত অধ্যাপক এবং ছাত্রীদিগকে মাল্য-চন্দন পরাইয়া সম্বর্দ্ধনার প্রথম কিস্তি সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু দক্ষিণা দেবী তৎক্ষণাৎ উহা পরিবর্তন করিয়া আরোগ্যালয়ের অভিভাবিকা ও সেবিকাদের নাম লিখিয়া দিলেন। ইহাতে কুমার সাহেব ও ডাক্তারের চোখে চোখে বিজলীর মত ইঙ্গিত খেলিয়া গেল এবং ডাক্তার শুধালেনঃ বীরমূর্তির মত আমিও একজন অধ্যাপক, এতবড় একটা প্রতিষ্ঠানের তত্বাবধান করি, আর কুমার সাহেব এর প্রতিষ্ঠাতা—বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদেরও আমরা শ্রদ্ধাভাজন। সুতরাং আমরা তাদের মাল্য-চন্দন পরিয়ে দিলে সেটা কি দোষের হোত ?

দক্ষিণা দেবী গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেনঃ নিশ্চয়ই। বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যাদের উদ্দেশে কথার উপচার ছাড়া মালা চন্দন পরিয়ে দেওয়া পুরুষের পক্ষে একান্ত অশোভন। আশ্চর্য এই যে, প্রথম দিনের অপ্রীতিকর ঘটনাতেও তোমার চৈতন্য হয় নি ; ওরা যে সম্পূর্ণ আলাদা ধাতের মেয়ে—এখনো কি সেটা বুঝতে পারোনি ?

ডাক্তার বিরক্তভাবে প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন বুঝিয়া কুমার সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন: উনি ঠিকই বলেছেন, আর যেভাবে সংশোধন করে দিয়েছেন—তাতে আমাদের বলবার কিছু নেই।

দক্ষিণা দেবী মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন: আমরা ওদের দুর্লভ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তারই উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এখানে আমন্ত্রণ করেছি। কোন দিক দিয়ে ওদের মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি থাকলেও, আজকের দিনে সে সব ভুলে যেতে হবে। অন্ততঃ এখানে এমন কোন কাজ আমরা করব না, কিম্বা তর্ক তুলব না, যাতে ওঁরা বিরক্ত হতে পারেন।

কুমার সাহেব সহজভাবেই বলিলেন: নিশ্চয়ই, ডাক্তার, মাথা ঠাণ্ডা করে কথাগুলি শোন হে! উনি অসঙ্গত কিছু বলেন নি।

দক্ষিণা দেবী কুমার সাহেব এবং তাঁহার স্বামীর অন্তর্নিহিত দুর্বল দিকটার সহিত সুপরিচিতা ছিলেন। বিদ্যাপীঠের অনুষ্ঠানের পর সেখানকার কন্যাগুলির রূপ ও গুণ যে উভয়কেই আকৃষ্ট করিয়াছে এবং কাণাঘুষায় ইহাদের সম্বন্ধে যে সব কথা রটিয়াছে, তাহাতে দক্ষিণা দেবীকেও রীতিমত সন্দিগ্ধ হইতে হইয়াছিল। এইজন্যই অনুষ্ঠানটির উদ্যোগপর্বে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সভাপতির আসনের সম্মুখে রক্ষিত টেবিলের কাগজপত্র তিনি পরীক্ষা করিতে থাকেন এবং পূর্বোক্ত ত্রুটিগুলির সংশোধন করিয়া দেন। পত্নীর ব্যবস্থায় ডাক্তার বি, এল, বি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেও কুমার সাহেবের কথায় তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইল।

বিদ্যাপীঠের উদ্বোধন সভায় দেশনেতা লালা লাজপত রায় সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়াছিলেন; এখানে কুমার সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ইন্দ্রনারায়ণের পিতা বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি বদ্রিনারায়ণজীকে সভাপতি মনোনীত করা হইয়াছে। এইভাবে ধনী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদিগকেই বাছিয়া

বাছিয়া ইঁহারা উৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সম্পত্তিশালীরূপে যাঁহাদের প্রতিষ্ঠা নাই, নিজস্ব বাড়ী, যানবাহন বা কোনওরূপ প্রতিষ্ঠানের মালিকরূপে সম্ভ্রান্ত-সমাজে যাঁহারা পরিচিত নহেন—উচ্চশিক্ষিত এবং সংস্কৃতি-সাধক হইলেও, তাঁহাদিগকে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয় নাই। নিমন্ত্রিতদের নামের তালিকা দেখিয়াই দক্ষিণাদেবী এই সকল তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু তখন আর সংশোধনের উপায় ছিল না। তিনি কথাপ্রসঙ্গে এক সময় কুমার সাহেবকে বলিলেন: নিমন্ত্রিতদের লিষ্ট দেখলাম।

প্রশ্নটা শুনিবামাত্র উৎফুল্ল মুখে কুমার সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করিলেন: কেমন দেখলেন বলুন ত? অনেক চিন্তা করে এবং দেখে শুনে নামগুলি সংগ্রহ করেছি। ওঁরা এলে সমস্ত রাস্তাটায় লাইন দিয়ে গাড়ী দাঁড়াবে।

মৃদু হাসিয়া দক্ষিণাদেবী বলিলেন: নামের তালিকা থেকেই সেটা জানা যাচ্ছে। গাড়ী আছে, ভূঁড়ি আছে, নিজের বাড়ী এবং কারবার আছে—টাকার কুমীর প্রত্যেকেই। তারপর বিদ্যাপীঠের বিদূষীদের দেখবার জন্যে ওঁরাও উদ্‌গ্রীব। ভুল বুঝে ফাঁদে পাও দিতে পারেন।

সচকিত হইয়া কুমার সাহেব প্রশ্ন করিলেন: একথা বললেন কেন?

দক্ষিণাদেবীও কণ্ঠস্বর দৃঢ় করিয়া বলিলেন: ভুল বলেছি কি? আপনাদের ব্যবস্থা দেখে আমারই মনে ধারণা জন্মেছে যে, বিদ্যাপীঠের মেয়েদের সঙ্গে নার্সিং হোমের সংযোগ ঘটাবার জন্যই আজকের এই অনুষ্ঠান করা হয়েছে। তারপর টাকার জোরে অসাধ্য সাধন করেছেন বলতে হবে। ব্যাপার দেখে কাল থেকেই এখানে 'বেড' পাবার জন্য সাধাসাধি সুরু হয়ে যাবে, নয় কি?

বক্রদৃষ্টি ডাক্তারের মুখে ফেলিয়া পরক্ষণে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ করিয়া

কুমার সাহেব দক্ষিণা দেবীর মুখপানে চাহিলেন। সেই দৃষ্টিতে প্রশংসার ভাব সূচিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি সহাস্যে বলিলেন : আপনার সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই! আমি জোর করে বলতে পারি—বিদ্যাপীঠের মেয়েরা যতই বিদুষী আর বাক্‌পটিয়সী হোক না কেন, আপনাকে তারা কোন দিক দিয়েই হারাতে পারবে না।

সংহত ও শান্ত স্বরে দক্ষিণা দেবী বলিলেন : তাহলে আমাকেও ভুল বুঝেছেন আপনি কুমার সাহেব। বিদ্যাপীঠের মেয়েগুলি আমার চোখে ভাল লেগেছিল, আমি তাদের দুর্লভ গুণের প্রশংসা করছি, কিন্তু সেজন্য মান ঈর্ষাও হয়নি, প্রতিযোগিতার কথাও ভাবিনি। তবে ওকথা বললেন কেন? বরং আমার অনুমানের কথাটাই চেপে গেলেন, আর বোধ হয় সেই জন্যেই—

তাড়াতাড়ি দক্ষিণা দেবীর কথায় বাধা দিয়া কুমার সাহেব বলিয়া উঠিলেন : না, না, আপনার অনুমানটি এত সত্য যে, ঐ জন্যেই ওভাবে কথাটা বলে ফেলেছিলাম দক্ষিণাদেবী!

একটু গম্ভীরভাবেই দক্ষিণা দেবী বলিলেন : দেখুন কুমার সাহেব, বিদ্যাপীঠের মেয়েগুলি শুধু ঐ ভুঁড়িওলা ব্যবসায়ীদের দিলগুলিই বিগড়ে দেয়নি, আপনাদের মত শিক্ষিত মার্জিত-রুচি দুই বন্ধুর চায়ের পেয়ালায়ও তুফান তুলেছে। সেটা আর কেউ না জানুক, আমার চক্ষু এড়ায় নি। কিন্তু আমি এর প্রতিবাদে জোর করে বলব—যে প্রতিষ্ঠানে দেশের ভদ্রঘরের মেয়েদের আনবার জন্য চেষ্টা-যত্ন চলছে, আমাকে বসিয়েছেন অভিভাবিকার আসনে, আর আপনারা দু'জনে হচ্ছেন কর্মকর্তা পরিচালক, সেখানে আপনাদের চায়ের পিয়ালা সামলে রাখাই উচিত। এর বেশী এখন আমি কিছু বলতে চাইনে।

কথাগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে শেষ করিয়াই দক্ষিণা দেবী অপর কোন কাজের সূত্রে ভিতরে চলিয়া গলেন।

ডাক্তার এই সময় একটু তফাতে গিয়া একখানা ছবির উপর দৃষ্টি সংযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু চিত্তটি এদিকে পত্নীর সহিত সংলাপরত কুমার সাহেবের দিকেই পড়িয়াছিল। দক্ষিণা দেবীর প্রস্থানের পরই তিনি কুমার সাহেবের নিকটে আসিয়া তীক্ষ্নস্বরে বলিলেন: আপনি ওঁকে অযথা প্রশ্রয় দিয়ে খুবই ভুল করেছেন কুমার সাহেব! আমাদের সঙ্কল্প উনি পণ্ড করবার জন্যেই যেন উঠে পড়ে লেগেছেন। এখন আমাদের উচিত হোচ্ছে—ওঁকে কোন রকম প্রাধান্য না দেওয়া।

কুমার সাহেব বলিলেন: কিন্তু উনি যে আমাদের ওপর বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন; অন্তত, বিদ্যাপীঠের ব্যাপারে আমাদের রুচি প্রকৃতি মনোভাব সব-কিছু ধরে ফেলেছেন, তাতে ভুল নেই। এখানকার ব্যাপারে ওঁকে নিয়েই সব আলোচনা চলে আসছে, বুদ্ধিমতীর মতই উনি পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের মনের গলদ আমরা চেপে রেখে কাজ বাগিয়ে চলেছি বলে যে ধারণাটি ছিল, সেটাও উনি ধরে ফেলেছেন। এ অবস্থায় কি করতে চাও? হয় ওঁর মতানুবর্তী হয়ে চলতে হবে, নয়ত—

ক্রুদ্ধভাবে ডাক্তার কুমার সাহেবের কথার পীঠে বলিয়া উঠিলেন: ওর মতামতের কোন পরোয়া না করেই আমরা আমাদের ইচ্ছা মতই চলব। আপনি এতে কোন আপত্তি করবেন না।

ঈষৎ হাসিয়া কুমার সাহেব বলিলেন: তোমার সাহস ত কম নয় ডাক্তার! ঘরে-বাইরে যদি ক্রমাগতই স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে বাদানুবাদ চালাতে থাক, জীবনটাই যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে সে কথা ভেবেছ?

ডাক্তার উপেক্ষার ভঙ্গীতে বলিলেন: সে যা হয় হবে, তার জন্যে ভাবলে চলবে না, আমরা কিন্তু এখন থেকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব, কুমার সাহেব। নারীদের মনের একটা সাইকোলজি হোচ্ছে—কুরূপা নারী, তা সে মূর্খই হোক বা যতই উচ্চ শিক্ষা পাক

—রূপসী নারীকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না; এদের মধ্যে বিবাহিতা যারা—স্বামীকে যমের মুখে ঠেলে দিতে পারে, কিন্তু কোন সুন্দরী নারীর ত্রিসীমাতেও ঘেঁসতে দিতে রাজী নয়।

অস্ফুটস্বরে কুমার সাহেব বলিলেন: কুরূপা নারী! ডাক্তার, তুমি দেখছি নিজের সংসারটিকে অশান্তির অগ্নিকুণ্ড করতে চলেছ? এ কিন্তু ভাল নয়।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বলিলেন: অগ্নিকুণ্ড এত দিন বুকের ভিতর জ্বলছিল কুমার সাহেব, বাইরের কেউ দেখেনি। এখন সেটা সংসারের বুকে এগিয়ে আসবে, হয়ত সকলেই জানবে, দেখবে। আজই হয়ে যাবে একটা মোক্ষম রকমের বোঝাপড়া।

বাইরে পেটা ঘড়িতে ঘা পড়তেই উভয়ে চমকিত ভাবে আলোচনা বন্ধ করিয়া সম্বর্দ্ধনা সভায় আমন্ত্রিতগণের সহিত বিদ্যাপাঠের অধ্যাপক ও ছাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্যে অবহিত হইলেন।

॥ আট ॥

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নার্সিংহোমের বিস্তীর্ণ অঙ্গনস্থ মণ্ডপটি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মঞ্চের উপর সভাপতির পার্শ্বেই বিদ্যা-পীঠের অধ্যাপক ও ছাত্রীদের বসিবার স্থান স্বতন্ত্র করিয়া রাখায় তাঁহাদিগকে অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। কিন্তু আমন্ত্রিতদের সংখ্যাধিক্য বশতঃ বিষম গোলযোগ ঘটিল। আসনের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নিমন্ত্রণ পত্র প্রচারের ত্রুটির জন্য কর্মকর্তাগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় অনুষ্ঠান বন্ধ রাখিয়া শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তাঁহারা অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া বীরমূর্তি বিদ্যাপীঠের ছাত্রী-দিগকে লইয়া আগাইয়া গেলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থায় অন্যান্য স্থান

হইতে বেঞ্চি ও কেদারাগুলি আনাইয়া মণ্ডপের প্রান্ত ও পুরোভাগে দেওয়া হইল, উপরন্তু সভাপতির আসনের পশ্চাতে অনুষ্ঠাতাদের জন্য সুরক্ষিত স্থানের মধ্যেই বিদ্যাপীঠের কন্যাদের স্থান করিয়া দিয়া কোনও প্রকারে স্থান সমস্যার সমাধান করা হইল।

আমন্ত্রিতপক্ষকে অযাচিতভাবে এখানকার অব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া কুমার সাহেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গগণ উৎফুল্ল হইলেও ডাক্তারকে রীতিমত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট দেখা গেল। কুমার সাহেব সবান্ধব অধ্যাপক বীরমূর্তিকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেও, ডাক্তার মুখখানা গম্ভীর করিয়া তাঁহার উদ্দেশে মন্তব্য করিলেন: আপনাকে আমন্ত্রণ করেছি সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য, কিন্তু আপনি কোমর বেঁধে ডিসিপ্লিন দেখাতে গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানকেই লজ্জায় ফেলেছেন।

বীরমূর্তি তৎক্ষণাৎ সহাস্যে কথাটার প্রতিবাদ করলেন: তাহলে সম্বর্দ্ধনা কথাটার অর্থই হয় না। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি এতই প্রীত হয়েছেন যে, সভা করে লোকজন ডেকেছেন সেটা জানাবার জন্যে আমরাও ছুটে এসেছি আপনাদের সাদর আহ্বান পেয়ে। এ অবস্থায় সভাস্থলে অব্যবস্থার দরুণ যদি কোনরকম গোলযোগ হয়, আমরা দর্শক হয়ে শুধু দেখবই বলতে চান? না, এখানে আমাদেরও কর্তব্য আছে মনে করি।

অধ্যাপকের মুখে অব্যবস্থা কথাটা শুনিয়া ডাক্তার আরও উগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন: আমরা সুব্যবস্থাই করছিলাম, এমন অনেক সভা আমরা ম্যানেজ করেছি। কার্ড বিলির ত্রুটিতেই এটা হয়েছিল, তা বলে আপনি ওকে অব্যবস্থার বলে—

তেমনই হাসিয়া অধ্যাপক বলিলেন: ব্যবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব হোলে সেই অবস্থাকেই অব্যবস্থা বলা হয়। এমন হয়েই থাকে, কিন্তু তার জন্য ক্ষুব্ধ হচ্ছেন কেন? আপনাদের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হোয়ে এসে ব্যবস্থার উপর হাত দিয়েছি বলেই কি—

কুমার সাহেব তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া সবিনয়ে কহিলেন ঃ না, না, আপনার সাহায্য পেয়ে আমরা বিশেষ উপকৃত হয়েছি। অধ্যাপক হোলেও আপনি যে বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, কার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পেয়েছি। তবে কর্মচারীদের ত্রুটির জন্য ডাক্তার সাহেব খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন ; সেই জন্যেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন নি—এর জন্যে আমিই আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

হো হো শব্দে হাসির স্নিগ্ধ ঝঙ্কার তুলিয়া এবং সেই সঙ্গে কুমার সাহেবকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া বীরমূর্তি বলিলেন ঃ দেখছি, চাচাজীর উদার প্রকৃতির অনেকখানি কুমার সাহেবও পেয়েছেন। তিনিও সামান্য কারণে বিনয়ে ভেঙে পড়তেন। তবে আমার কথা আলাদা—মানুষের কথার আঘাত সহ্য করতে পারি বলেই, কথকও প্রিয়তম হবার জন্য এগিয়ে আসেন।

এই সময় বাহিরে কলরব উঠিতেই বুঝিতে পারা গেল, সভাপতি মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে অলিন্দ অতিক্রম করিয়া সদলবলে তিনি মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এখন তাঁহার অভ্যর্থনা, আদর আপ্যায়ন এবং পরিচয় পর্বের পর সভাপতি বরণাদি প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি বীরমূর্তিজীর নির্দেশ মতই দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইয়া গেল।

সভাপতিবরণের পর সভার কাজ আরম্ভ হইল। কুমার সাহেব তাঁহার স্বর্গত জ্যেষ্ঠতাত ভগবতীপ্রসাদের অমর কীর্তি ভগবতী-বিদ্যাপীঠের প্রসঙ্গে তাঁহার স্থাপিত পাঞ্জাব নার্সিং হোমেরও উল্লেখ করিয়া বলিলেন ঃ বিদ্যাপীঠ ঋষিকল্প অধ্যাপক বীরমূর্তিজীর দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী চেষ্টায় তার বিশেষ প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে—বিভিন্ন প্রদেশের পনেরোটি ছাত্রীকে সর্বসাধারণের সামনে উপস্থিত করে। আর—পাঞ্জাব নার্সিং হোম বা পঞ্চনদ আরোগ্য নিকেতনের দরজা—ইউরোপ—প্রত্যাগত অভিজ্ঞ ডাক্তার বিহারীলালজী এবং চিকিৎসা-

বিদ্যায় পারদর্শিনী বিদেশের স্ত্রী-চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞা দক্ষিণা দেবীর তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি খোলা হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যাপীঠের মত এই প্রতিষ্ঠানটিও প্রসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়ে উঠবে। আজ আমরা এই আরোগ্য নিকেতন থেকেই ভগবতী বিদ্যাপীঠের ঋষিকল্প প্রবীণ অধ্যাপক এবং তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষা প্রভাবে কৃতবিদ্যা পনেরোটি প্রতিভাময়ী ছাত্রীকে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেছি। সহরের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট শিল্পপতি লালা বদ্রিনারায়ণজী এই অনুষ্ঠানে আমাদের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছেন এবং বহু বিশিষ্ট গুণী ও কর্মী ব্যক্তি সানন্দে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। আমাদের একান্ত আগ্রহ যে, আজকের এই অনুষ্ঠান একই মহাপুরুষের কীর্তিচিহ্নিত দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করবে, বিদ্যাপীঠের কৃতবিদ্যা বিদুষীদের প্রতিভার আলোকে আরোগ্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাধীনা তরুণীরাও আদর্শের পথ দেখতে পাবে।

বিপুল উল্লাসে সমবেতগণ কুমার সাহেবের কথাগুলি সমর্থন করিলেন। ইহার পর ডাক্তার বিহারীলাল তাঁহার ভাষণে বলিলেন: সকল দেশেই প্রতিভাকে সম্মান দেবার রীতি আছে। বিদ্যাপীঠের কন্যাদের বিদ্যার পরিচয় আমরা যথাসময় পেয়েছি। এঁরা প্রত্যেকেই দেশবিদেশের রাষ্ট্র, সমাজ, বর্তমান রীতিনীতি সম্বন্ধে পড়াশোনা করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তারই নিদর্শনে আমরা মুগ্ধ। আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে বর্তমানে এরকম অভিজ্ঞতালাভ খুবই প্রশংসার কথা। কিন্তু যাঁরা ওদেশের খবর রাখেন, তাঁদের পক্ষে এই শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বিশেষ রাখেন, তাঁদের পক্ষে এই শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছু বিস্ময়ের কথা নয়। ওখানে প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক মেয়েটি এইভাবেই শিক্ষিতা হয়ে থাকেন। তাহলেও, এদেশের পক্ষে অভিনব বলেই, আমরা এই শিক্ষিতা কন্যাগুলিকে এবং তাঁদের সঙ্গে বিচক্ষণ অধ্যাপক বীর-মূর্তিজীকে সম্বর্দ্ধনা করা প্রয়োজন বোধ করেছি। আর একটি কথা,

বিদ্যাপীঠের কন্যাগুলি অতঃপর যদি আরোগ্যনিকেতনে যোগ দেন—এখানকার বিচক্ষণ অভিজ্ঞ চিকিৎসাবিদ্‌দের সংস্পর্শে আসেন, তাহলে আরোগ্য নিকেতন ওঁদের সমস্ত ভার গ্রহণে প্রস্তুত এবং ওঁদের শিক্ষাও সুসম্পূর্ণ হবে।

ডাক্তারের ভাষণ সম্পর্কে সাধারণ শ্রোতাদের ভিতর হইতে উল্লাসধ্বনি উঠিলেও, বিদ্যাপীঠের কন্যারা তাহাতে যোগ দিতে বিরত রহিলেন। বক্তৃতা শুনিতে শুনিতেই তাঁহারা চাপা গলায় কোন কোন কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছিলেন। দক্ষিণাদেবী নিকটেই থাকায় ব্যাপারটি লক্ষ্য করিলেন। স্বামীর ভাষণের কোন কোন কথা তাঁহারও ভাল লাগে নাই। আরোগ্য নিকেতনের তত্ত্বাবধায়ক-রূপে তাঁহার এরূপ মন্তব্য এ-ক্ষেত্রে খুবই আপত্তিকর—যেহেতু সম্বর্ধনাকারীদের তিনিও অন্যতম। এ অবস্থায় দক্ষিণাদেবী বিদ্যা-পীঠের জনৈক কন্যাকে চুপি চুপি বলিলেন ঃ তোমরা রাগ ক'রনা, উনি যা বললেন ঠিক নয়—এখনি ওসব কথার প্রতিবাদ করা হবে।

কুমার সাহেবের নির্দেশমত সভাপতিও দক্ষিণাদেবীকে ভাষণ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নার্সিং হোমের পক্ষ হইতে কুমার সাহেব, ডাক্তার এবং দক্ষিণাদেবী এই তিন জন ভাষণ দিবেন, সভার সূচীতে এইরূপ উল্লেখ ছিল। সুতরাং দক্ষিণাদেবী ভাষণ দিতে উঠিয়া ভূমিকার পর এমন কতকগুলি কথা বলিলেন, আরোগ্য-নিকেতনের পক্ষভুক্ত মাত্রেই চমকিত হইয়া উঠিলেন। কুমার সাহেব চমৎকৃত হইলেও মনে মনে কৌতুক উপভোগ করিতে থাকেন, কিন্তু ডাক্তার একেবারে অগ্নিমূর্তি ধরিয়া গুমরাইতে লাগিলেন। এমন কি, কুমার সাহেব সভাপতিকে বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে আপত্তিকর বক্তৃতা বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এরূপক্ষেত্রে ডাক্তারকে সংযত করিবার জন্য কুমার সাহেবকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইল।

দক্ষিণাদেবীর ভাষণে যে কথাগুলি ডাক্তার অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করেন, সেগুলি এইরূপ ঃ

বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা, অসাধারণ প্রতিভা, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট পরিচয় পেয়েই এখানে তাঁদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য এর অনুষ্ঠাতাগণ নিশ্চয়ই—ধন্য হয়েছেন। ওদেশের প্রত্যেক মেয়েটিকে এভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, সুতরাং সেখানে এই শিক্ষার ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয় বলে এর গুরুত্বকে হাল্কা করার পক্ষপাতিনী আমি নই। ওদেশের মেয়েদের খবর আমারও ভালভাবে জানা আছে, আমি জোর করে বলতে পারি, পূজনীয় অধ্যাপক বীরমূর্তিজী কন্যাগুলিকে নিজে নির্বাচিত করে শিশুকাল থেকে যে-ভাবে পুরাকালের তপোবনের আদর্শে আশ্রমপালিতা ঋষিকন্যাদের মত প্রতিপালন করেছেন নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী করে তুলেছেন, মনন শক্তির উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তার তুলনা হয়না—কেননা, গঠনশক্তির এ এক নূতন রূপ। আমার মনে হয়, দীর্ঘ বারোটি বছর ধরে চেষ্টা যত্ন শিক্ষা পরীক্ষা প্রতীক্ষ প্রভৃতির পর এঁরা প্রত্যেকেই এক একটি 'সম্পূর্ণা নারী' হয়েছেন বুঝতে পেরেই তবে তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত করতে ভরসা পান। এখন না জেনে, না বুঝে, বিদেশের কথা তুলে শিক্ষায় দীক্ষায় অতুলনীয়া এই নারীরত্নগুলিকে খাটো করবার প্রচেষ্টা হাস্যকর বলেই আমি মনে করি। এমন কি, আরোগ্য নিকেতনে বহু অর্থব্যয়ে যে-সব কন্যাকে আনিয়ে শিক্ষা দিয়ে এখানকার উপযোগিনী করে তোলবার প্রচেষ্টা চলেছে, বিদ্যাপীঠের কন্যারা বহুপূর্বেই সে সব শিক্ষায় পটিয়সী হয়েছেন, সুতরাং আরোগ্য নিকেতনে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে কোন কথাই উঠে না। আমি নিজে কথা-প্রসঙ্গে ভালভাবেই এসব জেনেছি। সুতরাং আমার কথা হচ্ছে, আরোগ্যনিকেতনের পক্ষ থেকে আমরা দেশ ও জাতির গৌরবরূপিনী এই নারী রত্নগুলিকে, এবং যে ঋষিকল্প

মনীষীর অদ্ভুত শিক্ষায় এঁরা প্রত্যেকেই এভাবে বরণীয়া হয়েছেন, সেই আদর্শ আচার্য্যদেবকে সম্বর্ধনাসূত্রে যথাসাধ্য অর্চনা করব—এর বেশী আমাদের বক্তব্য নেই, কর্তব্যও এখানে সীমাবদ্ধ।

দক্ষিণাদেবীর ভাষণ নানা কারণে আরোগ্য নিকেতনের কর্তৃপক্ষদের মনঃপুত হয় নাই, এবং হইতেও পারে না। কিন্তু আমন্ত্রিতগণ প্রত্যেকেই তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ভাষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—বিপুল করতালির শব্দে সমগ্র আরোগ্যনিকেতন মুখরিত হইয়া উঠিল।

ওদিকে ডাক্তার এই অনর্থকর বক্তৃতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকায়—কুমার সাহেব তাঁহার কানে কানে অন্য যুক্তি দিয়া তাঁহাকে কোন প্রকারে নিরস্ত করিলেন। ডাক্তারের ক্ষোভ এই যে, বিদ্যাপীঠের কন্যাদিগকে বাড়াইতে গিয়া তাঁহাকে মিথ্যাভাষী প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে আরোগ্যনিকেতনে তাহাদের শিক্ষার পথেও বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

ইহার পর সম্বর্ধনার পালা। দক্ষিণাদেবী নার্সিং হোমের সেবিকাদিগকে লইয়া প্রথমেই আচার্য বীরমূর্তিকে অর্চনা করিলেন; তিনি নিজেই আচার্যের ললাটে চন্দনের প্রলেপ দিয়া এক ছড়া জুঁই ফুলের গোড়ে মালা পরাইয়া দিলেন; অতঃপর তাঁহার পদতলে স্বরচিত পুষ্প দল ও দুর্বাযুক্ত অর্ঘ দিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। বীরমূর্তিও সঙ্গে সঙ্গে সস্নেহে দক্ষিণাদেবীর মাথার উপর হাতখানি রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কুমার সাহেবের নির্দেশমত সভাপতিও এই সময় দক্ষিণাদেবীর হাতে গরদের জোড় দিলেন আচার্যকে উপহার দিবার জন্য। ইহার পর বিদ্যাপীঠের কন্যাদিগকেও চন্দনচর্চিত এবং মাল্যভূষিত করা হইল। নার্সিং হোমের সেবিকাগণও ইহাতে দক্ষিণাদেবীর সহিত যোগ দিলেন। আচার্যকে অর্ঘদানে অর্চনা করা হইয়াছিল; কন্যাদিগের হাতে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত এক একটি বৃহৎ ও অকৃত্রিম প্রবালযুক্ত রাখী বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

নার্সিংহোমের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা ও উপহার প্রদানের কাজ সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণ দিলেন। বিদ্যাপীঠের উদ্বোধন যেদিন হয়, তিনি যোগ দিতে না পারায় প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সেদিন যে সৌভাগ্যে তিনি বঞ্চিত ছিলেন, এদিন আরোগ্য নিকেতনের প্রবর্তক, তাঁহার অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধেয় বন্ধু, পুণ্যাত্মা রাজা ভগবতীপ্রসাদের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার সাহেব দেবী-প্রসাদের কল্যাণে সেই সৌভাগ্যলাভে ধন্য হইলেন। আচার্য বীর-মূর্তিকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছে, পুরাণ বর্ণিত গৌতম বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিরাও বুঝি এমনই ছিলেন। তিনি নিজে ব্যবসাদার মানুষ, পুরুষানুক্রমে ব্যবসায় আঁকড়াইয়া আছেন। উচ্চশিক্ষার সহিত কোন পরিচয় নাই ; কিন্তু তাহা হইলেও, সভাপতির আসনে বসিয়া বীরমূর্তিজী যে-ভাবে শিক্ষা দিয়া এতগুলি কন্যাকে একইভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সে কাহিনী শুনিতে শুনিতে তিনি অবাক হইয়া গিয়াছেন। কুমার সাহেব ইঁহাদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার বংশগত মহানুভবতা যেমন প্রকাশ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তাঁহার মত শিক্ষাদীক্ষাহীন একজন দোকানদারকে প্রধান আসনে বসাইয়া তেমনই লজ্জা দিয়াছেন। তবে দোকানদার হইলেও অন্তর আছে এবং সেই অন্তর হইতে যে বাসনা আসিয়াছে—এদিনের এই শুভ ব্যাপারটির স্মৃতিস্বরূপ তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নিবেদন করিতেছেন যে, তাঁহার নিজ কারখানাজাত একখানি করিয়া কাশ্মীর শাল দিয়া তিনি পূজ্যপাদ আচার্যদেবকে প্রণাম এবং বিদ্যাবতীদগকে আশীর্বাদ করিবেন।

এমন করুণ কণ্ঠে ও বিনয় সহকারে তিনি শেষের অনুরোধটি জানাইলেন যে, অধ্যাপক বীরমূর্তি তাঁহার প্রার্থনায় সম্মতি না দিয়া পারিলেন না। লালাজী এ সম্পর্কে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। এত বড় একটি অনুষ্ঠানে দেশবাসী তাঁহার ন্যায় অভাজনকে যখন এমন এমটি দুর্লভ স্থানে বসিবার জন্য আহ্বান

জানাইয়াছেন, সেখানে তাঁহার যথেষ্ট কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য পালনের জন্য কর্মচারীরা যথাযথ আদেশও পাইয়াছিল। সভাস্থলেই সর্বসমক্ষে একই প্রকারের মূল্যবান দুগ্ধফেননিভ শুভ্র শাল আসিয়া পড়িল। তিনি নিজেই আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত প্রত্যেকের হাতে হাতে সেগুলি অর্পণ করিতে লাগিলেন। নার্সিংহোমের শ্রীমতী দক্ষিণাদেবী এবং তাঁহার শিক্ষাধীনা সেবিকাগণও এই মূল্যবান শ্রদ্ধা উপহারে বঞ্চিতা হইলেন না।

উপহার-পর্ব শেষ হইলে সভাপতির অনুরোধে বিদ্যাপীঠের বিদ্যাবতীরা তাঁহাদের কিছু 'এলেম' দেখাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে অধ্যাপক বীরমূর্তি সমবেতগণের চিত্তবিনোদনের সহিত শিক্ষালাভের এক নাটকীয় অনুষ্ঠান অভিনয় করিয়া দেখাইবার প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে বিপুল উল্লাসের সহিত গৃহীত হইল।

অতঃপর পাটাতনে বাঁধা মঞ্চের মত যে স্থানটুকু সভাপতি, অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং আমন্ত্রিত বিশিষ্ট নরনারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাহাই খালি করিয়া নাট্যমঞ্চরূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইল।

নার্সিংহোমের আমন্ত্রণ পাইবামাত্র অধ্যাপক বীরমূর্তি বুঝিয়াছিলেন, সেখানকার কর্তৃপক্ষ বিদ্যাপীঠের কন্যাদিগকে ছাত্রীরূপে পাইবার জন্য অধীর হইয়াছেন এবং এই সূত্রেই তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার অভিনয়। তিনিও তৎক্ষণাৎ স্থির করেন, ছাত্রীদের দ্বারা এমন কিছু দেখাইবেন, ডাক্তার ও শিক্ষাধীনা সেবিকাদের ভুল তাহাতে ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং জনসাধারণের সমক্ষেও বিদ্যাপীঠের বিদূষীদের শিক্ষালব্ধ প্রতিভার আর একটা দিক উদ্‌ঘাটিত হইবে। সেইসূত্রে তিনি ছাত্রীদিগকে লইয়া প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। এই অভিনব নাট্যাভিনয়ের জন্য সূক্ষ্ম কতিপয় পরদা এবং আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা পেটিকাবদ্ধ অবস্থায় বিদ্যাপীঠের বৃহৎ ভ্যান গাড়ীর ভিতরে রাখা হইয়াছিল, এখন গাড়ী হইতে সেগুলি আনাইবার ব্যবস্থা হইল।

॥ নয় ॥

অল্প সময়ের মধ্যে অনুচ্চ মঞ্চের উপর কেবলমাত্র সময়োপযোগী কতকগুলি পরদার সাহায্যে বিচিত্র এক নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়া গেল। পুরোভাগে যবনিকাটি পূর্বেই ফেলিয়া দিয়া তাহার ভিতরে দৃশ্য সংস্থান হইতেছিল ; সে কাজ সম্পন্ন হইবামাত্র শঙ্খ ধ্বনির সহিত যবনিকা উঠিল।

দেখা গেল—দৃশ্যটি একখানি বাড়ির বাহির দিকের অলিন্দ। দেওয়ালে ছোট একখানি সো-কার্ডে লেখা রহিয়াছে, 'ভারতী সেবা-সদন—প্রতীক্ষার স্থান।' ইংরাজীতে যাহাকে ওয়েটিং রুম বলা হয়। সারি সারি তিনখানি বেঞ্চির উপর ৮৷১০টি তরুণী উপবিষ্টা। তাহাদের সংলাপ হইতে উপস্থিতির কারণ জানা গেল। বিদ্যাপীঠের কন্যারাই সময়োচিত সাজসজ্জায় অবতীর্ণা এবং নাট্যেবর্ণিত নামে অভিহিতা।

করুণা নাম্নী তরুণীটি ব্যস্তভাবে বলিল ঃ বসে বসে পা ধরে গেল যে—কখন ডাক পড়বে ?

মাধবী—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—যখন ডাক্তারবাবুর মর্জি হবে।

রাধা—ভেবেছিলুম—দরখাস্ত পেয়েই যখন ডেকেছে, আসবামাত্র চাকরী পাব ! ওমা ! এখন দেখছি, শুধু আমি নই—আমার মতন আরও…এই আপনাদের কথাই বলছি।

সাবিত্রী—আমিও ঠিক আপনার মতই ভুল বুঝেছিলুম যে আসবামাত্রই নাম লিখে নিয়ে রুগী দেখতে পাঠাবে ডাক্তার।

চন্দ্রা নাম্নী একটি মেয়ে একখানি বেঞ্চের শেষপ্রান্তে বসিয়া সেদিনের সংবাদপত্র পড়িতেছিল। সাবিত্রীর কথা শুনিয়া কাগজ হইতে মুখখানি তুলিয়া সাবিত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ঃ পরীক্ষা না করেই ?

সাবিত্রী মেয়েটি তৎক্ষণাৎ ঝঙ্কার দিয়া তীক্ষ্নস্বরে বলিয়া উঠিল : পরীক্ষা আবার কিসের ? কাজ করব বলে এসেছি—এই এদের সাত পুরুষের ভাগ্যি। এরাও এই প্রথম ভদ্রঘরের লেখাপড়া জানা মেয়েদের ডেকেছে—আমরাও প্রথম এসেছি। আবার পরীক্ষা করবে মানে ?

তাহার কথার রুক্ষতা এবং বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া চন্দ্রা সহাস্যে বলিল : এঁরা যখন কাজে লাগিয়ে মাইনে দেবেন, বাজিয়ে দেখবেন না—আমরা কিরকম শিক্ষা পেয়েছি, রোগীর সেবা শুশ্রূষা করতে জানি কি না ?

সাবিত্রী এবার মুখখানা মচকাইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল : আহা-হা —কথার ঢং দেখনা ! মেয়েমানুষকে আবার সেবা শুশ্রূষা শেখাতে হয় নাকি ? জানেন—আমার কাকাবাবু নামকরা ডাক্তার, তাঁর কাছে আমি শিখিছি ? আমাদের বাড়িতে কারও অসুখ-বিসুখ হোলে আমাকেই ত সব করতে হয় !

বিজলী নামে আর একটি প্রতীক্ষারতা মেয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনার কাকা যখন ডাক্তার, তখন আপনি কেন হাসপাতালে চাকরী করতে এসেছেন, তিনিই ত আপনাকে—

বিজলীকে বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল : কাকাই ত বললেন আসতে। এরা যখন মেয়ে নিতে চেয়েছে, ভালরকম মাইনেও দেবে বলেছে— তখন প্রথমেই যারা যাবে, তাদেরই উন্নতি হবে। সেই জন্যেই কাকা বললেন—লেগে যাও, পিছনে আমি আছি। আগে কি মেয়েদের পাত্তা দিত, পুরুষরাই সব করত। কে জানে কেন—মেয়েদের বরাতে সিকে ছিঁড়ল !

চন্দ্রা মেয়েটি পুনরায় কাগজের উপর হইতে তাহার সুন্দর সুশ্রী মুখখানি তুলিয়া বলিল : এর কারণ কি জানেন—ওদেশে এই যে যুদ্ধ হয়ে গেল, তাতে দুটি বিষয়ে ইংরেজরা মেয়েদের দক্ষতা জানতে পেরে তাদের কাজে লাগিয়ে নানাদিক দিয়ে উপকৃত

হয়েছেন। প্রথমটি হোচ্ছে—রান্নাবান্না ; আগে যুদ্ধক্ষেত্রে পলটনদের জন্য পুরুষরাই রাঁধত, কিন্তু এবারকার মহাযুদ্ধে পুরুষের অভাব হওয়ায়, গৃহস্থ ঘরের রান্নাবান্নায় পাকাপোক্ত মেয়েদের নেওয়া হয়। তার ফল সব দিক দিয়ে ভাল হোতে কর্তৃপক্ষ বাবুর্চীখানার ভার পুরোপুরিভাবে মেয়েদের হাতেই দিয়েছেন ; এতে নাকি আগেকার তুলনায় অনেক কম খরচে রান্না হচ্ছে, আর ভালো খানার জন্য স্বাস্থ্যও ভাল থাকছে—সুবিধাও অনেক হয়েছে।

সাবিত্রী—তাই নাকি ? তা, আর একটি কি ?

চন্দ্রা—আমরা যে জন্যে এখানে এসেছি—রোগীর সেবা। আগে এ কাজও পুরুষরা করত ; বিশেষ করে, লড়াই, ট্রেণ-কলিসন, মড়ক প্রভৃতি বড় বড় দুর্ঘটনায়। প্রথমে কুমারী নাইটেঙ্গেল ও ডোরা নামে দুটি মেয়ে যুদ্ধে আহতদের দারুণ দুরবস্থা দেখে কর্তাদের রাজী করে সেবার ভার নেন। তাঁদের অদ্ভুত সেবা শুশ্রূষা দেখে সবাই অবাক হয়ে যান, আহত সৈনিকদের মনে হয়, করুণাময়ী মেরীই বুঝি স্বর্গ থেকে তাদের কাছে এসেছেন রক্ষা করতে। এঁদের শিক্ষার জন্য অনেক সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এবারের যুদ্ধেও মিত্রপক্ষ থেকে হাজার হাজার মেয়ের ওপর আহতদের সেবার ভার দেওয়া হয়, তার ফলে মেয়েদের সেবা শুশ্রূষায় মিত্রপক্ষের লক্ষ লক্ষ আহত সৈনিক জীবন ফিরে পেয়েছে—খবরের কাগজেও খুব বড় করে এ খবর ছাপা হয়েছে। ঐ আদর্শেই এদেশে এঁরাও সেই জন্যে নিজেদের সেবা-প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলক-ভাবে আমাদের ডেকেছেন। আরও শুনেছি এখানে আছেন তিনি খুব গুণী ব্যক্তি। যুদ্ধের সময় ইউরোপে তিনি ছিলেন, অনেক কিছু ও দেশের দেখেছেন। যুদ্ধের পর দেশে ফিরতেই এঁরই ওপর সেবাসদনটির ভার পড়েছে। ইনিও নিজের মনের মতন করে একে গড়বার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। আমাদের ডেকেছেনও ইনি।

কমলা নাম্নী আর একটি মেয়ে এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই,

নিবিষ্ট মনে ইহাদের সংলাপ শুনিতেছিল। এই সময় সে বলিল: আপনি দেখছি হুনিয়ার অনেক খবর রাখেন, পড়া শোনাও বোধ হয় অনেক করেছেন!

সাবিত্রী—তাহলে আপনার ভাগ্যেই সিকে ছিঁড়বে দেখছি। আপনিই চাকরী পাবেন, আর আমরা—

সাবিত্রীর কথায় বাধা দিয়া চন্দ্রা বলিল: আগে থেকেই আপনার হতাশ হবার ত কোন কারণ নেই। আপনারা বোধ হয় ঠিক খবর পাননি; এখানে একটি মাত্র মেয়েকেই নেওয়া হবে না। ভারতবর্ষের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে আফিসে চাকরী করবে, কিংবা সেবা-সদনে সেঁধুবে—এ সব এতদিন কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল, তবে এই বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া ফিরেছে। এদেশেও একজন ঋষিকল্প শিক্ষাবিদ্ পাঞ্জাবে এক বিদ্যামন্দির খুলে মেয়েদের এই সব শিক্ষার পথ খুলে দিয়েছেন; তাঁরাই সেখান থেকে বেরিয়ে এসে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার করছেন এবং এঁদের শিক্ষা যাতে অর্থকরী হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রেখেছেন। তবু দেশের লোক এই নিয়ে কত আন্দোলন তুলেছে! কিন্তু ঐ মেয়েগুলি, আর এখানকার এই ডাক্তরটি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। খবরের কাগজে এই জন্যই ইনি জানিয়েছেন—'ভারতীয় সেবা-সংসদে কাজ করবার জন্য সর্বভারতের মেয়ে চাই। যাঁদের সেবা কার্যে অভিজ্ঞতা আছে, উৎসাহ বা আগ্রহ আছে, সেবার সঙ্গে চিকিৎসার কাজও শিখতে চান, তাঁরা এগিয়ে আসুন। এখন যোগ্যতা অনুযায়ী মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে. পরে বাড়বে।'—বিজ্ঞাপনটি ঠিক এই রকম। কিন্তু এতে তো এঁরা বলেননি, শুধু একজনকেই নেওয়া হবে—আর, সেই একজন মনোনীতা হোলেই আর সকলকে বিদেয় করে দেবেন! দেশের মেয়েদের জড়তা ও লজ্জা ভাঙাবার জন্যই যাঁরা এই প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, মেয়েদের ডেকেছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই বিচার-বিবেচনার শক্তি আছে; অন্তর দিয়ে তাঁরা

অবস্থা বুঝতে পারেন। কাজেই আমাদের ঘাবড়াবার কিছু নেই।

কিন্তু ওদিকে দ্বিতলের একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষের পার্শ্বে বসিয়া জনৈক প্রবীণ পুরুষ আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষাগৃহে সমবেত কন্যাগুলির সংলাপ শুনিতেছিলেন। সূক্ষ্ম পরদা দিয়া আবৃত করা সেই গুপ্ত স্থানটি তরুণীদের মধ্যে কেহই লক্ষ্য করে নাই। চন্দ্রা মেয়েটির মুখে বিশদভাবে সেবাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কথাগুলি শুনিতে শুনিতে উপরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত সেই প্রবীণ ব্যক্তির গম্ভীর মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। এদিকে, তরুণীরাও বুঝিল, চন্দ্রা মেয়েটি এ সব ব্যাপারে রীতিমত অভিজ্ঞতা, উচ্চ শিক্ষিতা, এবং আধুনিকা।

বিজলী নাম্নী মেয়েটি চন্দ্রাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল: আপনি দেখছি অনেক কিছু জানেন। আমরা বিজ্ঞাপনটি ভাল করে পড়িনি, নাম ঠিকানা যোগাড় করেই ছুটে এসেছি, যেন এঁরা আমাদের জন্যেই হা-পিত্তেস করে বসে আছেন!

চন্দ্রা বলিল: তাহলেও, এঁরা যদি বিবেচক হন, পরীক্ষার সঙ্গে এটা ভেবে দেখবেন—আজকের দিনে এভাবে এগিয়ে আসাও এ দেশের মেয়েদের পক্ষে সামান্য সাহস ও শক্তির কথা নয়। এ জন্যও, অন্ততঃ উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে এঁরা আমাদের সকলকেই নেবেন।

সাবিত্রী মেয়েটি এ কথার উত্তরে ঝাঁঝাইয়া বলিল: আর, আপনি বেশী কথা বলতে পারেন বলেই বুঝি মনের মধ্যে ঠিক দিয়ে রেখেছেন—আপনাকে এঁরা সসম্মানে আগেই নেবেন?

চন্দ্রা বলিল: সেটা এদের পরীক্ষা আর আমার যোগ্যতার ওপরেই নির্ভর করছে; মনে মনে আমরা যেটা ঠিক দিয়ে রাখি, সব সময়েই কি মিলে যায়?

এই সময় ভিতরের দিকের দরজা খুলিয়া পরদার পাশ দিয়া একটি দশ বারো বছরের বালক কাঁদিতে কাঁদিতে সবেগে ছুটিয়া আসিল; কালো কুৎসিৎ চেহারা পরণে এক টুকরা ময়লা কাপড়,

পায়ে ও পীঠে পট্টি বাঁধা, অত্যন্ত নোংরা। চেহারা দেখিয়া অন্ত্যজ শ্রেণীর ঘরের ছেলে বলিয়া মনে হয়। পরক্ষণে চাবুক হস্তে একটি স্থূলাঙ্গী মহিলা তাহার পিছু পিছু ধাইয়া আসিয়া পুনরায় প্রহার করিবার জন্য চাবুক উচাইল। ছেলেটি কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল: আর করব না, এমন কাজ আর করব না, আমাকে আর মোরা না—মরে যাবো।

সরোদনে কাতরকণ্ঠে কথাগুলি বলিতে বলিতে সে পাশাপাশি উপবিষ্টা মেয়েগুলির প্রত্যেকের মুখের পানে তাকাইয়া কাছ ঘেসিয়া যাইতে লাগিল; উদ্দেশ্য কেহ যদি কৃপা করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া অভয় দেয়। কিন্তু একে একে প্রত্যেক মেয়েটিই ঘৃণায় সঙ্কুচিতা হইয়া স্ব স্ব দেহ সম্ভবমত সরাইয়া লইল। কেহ কেহ কর্কশকণ্ঠে সরিয়া যাইবার জন্য ছেলেটিকে হুমকিও দিল। একমাত্র চন্দ্রা মেয়েটি খপ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে ও সহানুভূতির স্বরে বলিল: চুপ করো, কেঁদোনা; তোমাকে তো মারেনি—তবে কেন কাঁদছ?

ছেলেটি সভয়ে অদূরবর্তিনী স্থূলকায়া নারীটিকে দেখাইয়া বলিল: খুব মেরেছে, অনেক মেরেছে, আবার মারবে।

সেই নারীটিও তর্জন করিয়া বলিল: মারবে না? যে কাজ করতে বারণ করব, তাই করবে। ডাক্তারবাবু তোমাকে—

এমন সময় এক দীর্ঘাকৃতি সৌম্যমূর্তি শ্মশ্রুধারী প্রবীণ ব্যক্তি দরজার উপর ফেলা পরদাখানির পীঠে পীঠ দিয়া দাঁড়াইয়া এক নজরে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেকের মুখগুলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: কি হয়েছে—ব্যাপার কি?

মোটাসোটা অথচ পরিষ্কার কাপড় তাঁর পরণে, গলাবন্ধ কোট গায়ে, পায়ে চটি; স্টেথিস্কোপের নলটি জামার পকেট ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যদি কেহ দ্বিতলের গবাক্ষপথে উপবিষ্ট পুরুষ মূর্তিটি দেখিয়া থাকিতেন, তাঁহার পক্ষে চিনিতে অসুবিধা হইত না যে,

সেই ব্যক্তিই এখানে এভাবে আসিয়াছেন এবং ইনিই এই সেবা-সদনটির সর্বাধ্যক্ষ ডাক্তার দয়াময়। যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত পরিচিত, তাঁহারা প্রত্যেকে এই সদাশয় ডাক্তারটিকে ধন্বন্তরী জ্ঞানে বলেন যে, ইঁহার পিতামাতা শৈশবেই বুঝি ছেলেটির ভবিষ্যৎ জানিয়া দয়াময় নামকরণ করিয়াছিলেন! নামেও ইনি যেমন দয়াময়, ব্যবহারেও তাই। আতুর দুঃখীদের প্রতি ইঁহার দয়ার অন্ত নাই।

ডাক্তার দয়াময়কে দেখিয়া স্থূলকায়া নারীটি নীরবে ছেলেটিকে দেখাইয়া বলিল : ঐ যে!

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন : খাসা হয়েছে। ওকে দুটো রসগোল্লা খাইয়ে দিও।

ডাক্তারের কথার সঙ্গে ছেলেটিরও মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, সে যে এইমাত্র কাতরকণ্ঠে কাঁদিতেছিল, তাহার কোন নিদর্শন দেখা গেল না, বরং হিঃ হিঃ শব্দে জোরে হাসিতে হাসিতে স্নেহশীলা মেয়েটির হাত ছাড়াইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই পলাইল। স্থূলকায়া নারীটিও মুখ টিপিয়া হাসি চাপিয়া ছেলেটির অনুসরণ করিল।

মেয়েগুলি এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রা ভিন্ন অন্যান্য মেয়েগুলি তাহাদের স্থানে বসিয়াছিল, ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রাকে উঠিতে হইয়াছিল, তাহার পর আর বসিবার অবসর ঘটে নাই। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুক ব্যক্তিটির দিকে তাকাইয়া অভিবাদন করিতেই তিনিও প্রত্যভিবাদন করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন : আমিই তোমাদের ডেকেছি, আমাকেই সকলে ডাক্তার দয়াময় বলে।

তখন অন্যান্য তরুণীরাও সসম্ভ্রমে উঠিয়া এই অদ্ভুত মানুষটিকে অভিবাদন করিল। তিনিও প্রত্যভিবাদন করিতে করিতে বলিলেন : আমার সঙ্গে ভিতরে চল—সেখানেই কথা হবে।

॥ দশ ॥

ডাক্তার দয়াময় নবাগতা তরুণীগুলিকে লইয়া সেবা-সদনের অভ্যন্তরে চত্বরে প্রবেশ করিতে করিতে সকলকেই উদ্দেশ করিয়া বলিলেন ঃ বাইরের ঘরে তোমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছ। এখন আমাদের সংসদটা আগে ভাল করে দেখ—তোমাদের এই দেখার সঙ্গে আমারও কিছু কিছু দেখা হবে।

কথার সহিত ডাক্তারের চরণ দুইখানিও অগ্রসর হইতেছিল, সুতরাং তরুণীদিগকেও তাঁহার অনুসরণ করিতে হইল।

ইহার পর একখানি লম্বা ঘরের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিলেন। সেই ঘরখানির মধ্যে দুইজন ভৃত্য রোগীদের চারপাই সাজাইতেছিল। কাজ সমাপ্ত হইলে তাহাদিগকে শয্যায় আনা হইবে। চারপাইয়ের উপর ধোপ-দুরস্ত চাদর ও আচ্ছাদন দেওয়া বালিস দিতেই শয্যা-গুলির শ্রী ফিরিয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন ঃ কেমন দেখছ, ঠিক হয়েছে ত?

আর সকলেই ঘাড়টি ঈষৎ দুলাইয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিল। শয্যা, আস্তরণ, বালিস—কোথাও খুঁত নাই। কিন্তু চন্দ্রা সহজ কণ্ঠে বলিল ঃ মূলেই গোল হয়েছে দাদু!

দাদু! বড় মিষ্ট ডাক; ডাক্তারের সমস্ত অন্তরটি আনন্দে দুলিয়া উঠিল। তিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে কিছুক্ষন চাহিয়া থাকিয়া রহস্যময় সুরে বলিলেন ঃ বেশ ত মিষ্টি করে ডাকলে, কিন্তু খুঁতটি ধরেই সব যে গোলমাল করে দিলে! কি গলদ দেখলে দিদি?

চন্দ্রা সংযত কণ্ঠে বলিল ঃ আপনার চোখে কি গলদটা ধরা পড়েনি দাদু? তা তো মনে হয় না।

দাত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমরা বুড়ো হয়েছি, আগেকার মত কি আর চোখের জোর আছে ? তুমিই দেখিয়ে দাও।

চন্দ্রা বলিল ঃ চাকরগুলো ঠিক ঠিক জায়গার রোগীদের চারপাই পাতেনি। জানালার দিকে চেয়ে দেখুন—সূর্যের কিরণ কোথায় এসে পড়েছে। একটা বিছানাও ঐ দুর্লভ বস্তুটির পরশ পায়নি।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাতে কি হবে ?

চণ্ডী বলিল ঃ ঘরের যেখানে সূর্যের কিরণ পড়ে, সেইখানেই রোগীর বিছানা পাতা উচিত! এখানে কিন্তু এই উল্টো ব্যবস্থা দেখে কষ্ট হোচ্ছে দাত্ব! আমার এক দাত্ব বলতেন—রোগীর বিছানায় যদি সূর্যের কিরণ পড়ে, তাহলে সমুদ্রতীরের যে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় বাস করার ফল পায় সেই রোগী।

ডাক্তর বলিলেন ঃ বটে। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার সেই দাত্বটি কে ?

চন্দ্রা উত্তর করিল ঃ অধ্যাপক বীরমূর্তি।

দাত্ব বলিলেন ঃ যিনি পাঞ্জাবের অমৃতসরে ভগবতী হিন্দ্যাপীঠ খুলেছিলেন ?

চন্দ্রা স্মিতমুখে বলিল ঃ হ্যাঁ।

চন্দ্রার দিকে কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া ডাঃ দয়াময় বলিলেন ঃ এই জন্যই গোড়া থেকে তোমার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখেছি। যাক, ও-ঘরের মত এ-ঘরের পরীক্ষায়ও তুমিই পাস করলে।

অধ্যাপক তখন ভৃত্যদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে চারপাই-গুলো যে-ভাবে ছিল, আবার যেন তেমনই করিয়া পাতিয়া রোগীদিগকে শোয়াইয়া দেয়।

ইহার পর শুধু চন্দ্রা কেন, অন্যান্য মেয়েগুলিরও বুঝিতে আর বাধিল না যে, পরীক্ষার জন্যই এই বিচিত্র ডাক্তারটি তাহাদের সম্মুখেই ভৃত্যদের দিয়া চারপাইগুলো ঐভাবে পাতিবার ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন। এই সময় সাবিত্রা মেয়েটি গলায় জোর দিয়া সাহস করিয়া বলিল: ডাক্তারবাবু, আপনি যে ও-ঘরের পরিক্ষার কথা বললেন, কিন্তু ওখানে ত কোন পরাক্ষা—

ডাক্তার দয়াময় হাসিয়া বলিলেন: বিলক্ষণ! ও ঘরের পরীক্ষাটা টের পাওনি তোমরা—সত্যই? কিন্তু আমি আড়াল থেকে তোমাদের সব কথা শুনিছি, আর সেই কথা থেকেই চিনে ফেলিছি—তোমরা কে কি রকম প্রকৃতির। তারপর সেই যে গায়ের ঘায়ে পট্টি বাঁধা বিশ্রী ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যায় তোমাদের কাছে; তোমরা শিউরে উঠেছিলে পাছে ছুয়ে দেয়! এ থেকেই তোমাদের মনের পরীক্ষা হয়ে গেছে। ওখানেও কেবল এই মেয়েটি ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করেছে, কিন্তু তোমরা ফেল করেছ। এসেছ এখানে সেবা করবার উদ্দেশ্যে—অথচ ছেলেটার বিশ্রী চেহারা দেখে ঘৃণায় কেঁচোর মত শিউরে উঠেছিলে! ঐ সময় তোমাদের মুখের ভাব আমার চোখের ক্যামেরায় উঠে যায়। এখন কথা হোচ্ছে—শিক্ষা চাই। তোমাদের এখানে আসাটা ব্যর্থ হবে না, সবাইকে নেওয়া হবে এখানে, কাজ পাবে, বৃত্তিও মিলবে, কিন্তু শিক্ষা করতে হবে এই সেবা বিদ্যাটি—একেবারে বর্ণপরিচয় থেকে।

এই পর্যন্ত বলিয়াই ডাক্তার দয়াময় চন্দ্রাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমার নামটি দিদি—

চন্দ্রা বলিল: শ্রীমতী চন্দ্রা—কুমারী বলতে বাধা নেই।

ডাক্তার দয়াময় বলিলেন: সে ত তোমার দরখাস্তেই জানিয়েছ। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই চন্দ্রার কাছেই তোমরা সেবা বিদ্যা শিখবে একেবারে অ আ থেকে।

সাবিত্রী কুণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল: এঁর কাছে?

তীক্ষ্নদৃষ্টি মেয়েটির মুখে নিবদ্ধ করিয়া ডাক্তার বলিলেন: সঙ্কোচ হোচ্ছে এঁর কাছে শিক্ষা নিতে—বিশ্বাস হোচ্ছে না? বুঝেছি,

এখনো চিনতে পারনি এঁকে ? বেশ, চল আমার সঙ্গে—হাতে কলমেই জানতে পারবে সব।

সাবিত্রী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন: না, না, উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হবে না। চোখে দেখে হাতে কলমে যাচিয়ে নেওয়াই ভাল। আমারও ভুল হওয়া ত বিচিত্র নয়—চল।

সকলকে লইয়া ডাক্তার রোগীদের সাধারণ ঘরে আসিলেন। এক একটি শয্যায় এক একজন রোগী শুইয়া আছে। তাহাদিগকে প্রত্যহ এই সময় ডাক্তার দয়াময় পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি আজ পরীক্ষার ভার দিলেন চন্দ্রাকে। বলিলেন: তুমি দেখ। এই স্টেথিস্‌কোপ নাও।

চন্দ্রা বলিল: আমার কাছেও আছে—আপনি রাখুন।

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন: ওটাও এনেছ সঙ্গে করে ?

চন্দ্রাও মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল: আমাকে যখন চিকিৎসক বলে মেনে নিয়েছেন, ও-জিনিস ত সাথীর মত কাছে থাকবেই।

ডাক্তার বলিলেন: ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল।

চন্দ্রার বস্ত্রাভ্যন্তরেই ছোট একটি থলির মধ্যে স্টেথিস্‌কোপ ছিল। সেটি বাহির করিয়া প্রথম রোগীটির দিকে সত্য সত্যই চন্দ্রাকে যাইতে দেখিয়া ডাক্তারের সহকারী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন: ইনি কি সত্যই রোগীকে দেখবেন ?

ডাক্তার বলিলেন: এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার মানে ? আমি কি ওঁকে নিয়ে খেলা করতে এসেছি ? হ্যাঁ, আমার কাজ আজ উনিই করবেন ; তুমি চার্ট নিয়ে সঙ্গে থাক, টুকে নেবে। আর তোমরা আমার কাছে দাঁড়িয়ে ব্যাপারখানা দেখ।

ডাক্তারের কথা শুনিয়া তাঁহার সহকারী ডাঃ সেন রোগীর বিছানার কাছে গিয়া চন্দ্রার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া চন্দ্রা চিকিৎসকদের পরিচিত সংক্ষিপ্ত

কথায় তাহার মন্তব্য বলিলে, ডাঃ সেন হতচকিত ভাবে লিখিতে লাগিলেন। এই ভাবে স্টেথিস্‌কোপ ও থারমোমিটারের সাহায্যে পর পর কয়েক জন রোগীকে চন্দ্রা পরীক্ষা করিল, জিভ দেখিল, কষ্টের কথা জানিল, এবং ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিল। একজন রোগীকে ইন্‌জেকসন দিবার জন্য উল্লেখ করিল। ডাঃ সেন তাঁহার চার্টে সমস্তই টুকিয়া লইলেন। চন্দ্রা কর্ত্তৃক রোগ পরীক্ষা, রোগের নাম, ঔষধ পথ্য সম্বন্ধে নির্দেশ এমন ভাবে বিবৃত হইল যে, দর্শকবৃন্দ সকলে অর্থ বুঝিতে না পারিলেও শুনিতে পাইলেন; রোগী দেখা শেষ হইলে চন্দ্রা তাহার যন্ত্রপাতি যথাস্থানে রাখিয়া থলির ভিতর হইতে পরিষ্কার রুমালখানি বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে ডাক্তার রায়ের পদতলে মাথাটি নত করিয়া শ্রদ্ধা জানাইল। তিনিও সস্নেহে চন্দ্রাকে আশীর্বাদ করিয়া সেনের হাত হইতে চার্টখানি টানিয়া লইলেন। চশমা খুলিতে খুলিতে সেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কি রকম দেখলে?

ডাঃ সেন কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। বলিলেন: অদ্ভুত! আমি ভাবতেও পারিনি, ইনি এমন নিখুঁতভাবে ডাক্তারী শিখেছেন, কোথাও কোন গলদ করেন নি।

বক্র দৃষ্টিতে সাবিত্রী মেয়েটিকে বিদ্ধ করিয়া ডাঃ দয়াময় বলিলেন: শুনছ ত? ইনিও মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করা এম. বি. ডাক্তার।

চার্টখানি দেখিতে দেখিতে ডাক্তার হঠাৎ থামিয়া বলিলেন: আরে, একটা এমিটিন ইন্‌জেকসন্ রয়েছে যে! ভালোই হয়েছে— ডাক্তার চন্দ্রাই ইন্‌জেকসন্ দেবেন।

চন্দ্রা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া ডাঃ সেন বলিলেন: তাহলে ইন্‌জেকসনের তোড়জোড় সব আনাই?

চন্দ্রা বলিল: নিশ্চয়ই। আমি ঠিক আছি।

একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনিই ইন্‌জেকসন দেবেন ?

মৃদু হাসিয়া চন্দ্রা বলিল ঃ দাদু যখন বলছেন, না বলতে পারি না ত।

ইতিমধ্যে ইন্‌জেকসনের জিনিসপত্র আসিয়া পড়িল। ষ্টোভে জল গরম করিতে দিয়া চন্দ্রাও প্রস্তুত হইল। তাহার পর সবার চক্ষুর উপর চন্দ্রা নির্দিষ্ট রোগীটিকে নিখুঁতভাবে ইন্‌জেকসন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল।

এখন সেই সাবিত্রী নাম্নী দাম্ভিকা মেয়েটিই আগাইয়া আসিয়া চন্দ্রাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন করিয়া বলিল ঃ আমাকে ক্ষমা করুন চন্দ্রাদি, মস্ত অন্যায় এবং অপরাধ আমি করেছিলুম। এখন বুঝলুম, সত্যিই আপনি কত বড়।

কমলা নাম্নী মেয়েটি বলিল ঃ দেখুন, সেবাসদনে আমরা কাজ করব বলে এসেছি, অথচ এমনি আমাদের ভুল সংস্কার যে, আমাদের মতই একটা মেয়ে ডাক্তারী শিখে ডাক্তারদের মতন চিকিৎসা করতে পারে, একথা বিশ্বাস করতেই চাইছিলুম না। আজ এখানে নিজের চোখে না দেখলে ঐ ভুল ধারণাই মনে থাকত।

ডাক্তার দয়াময় এই সময় গম্ভীরভাবে বলিলেন ঃ শুধু তোমরা কেন, এই নার্সিং হোমের পাস-করা ডাক্তার পর্যন্ত ভুল করেছিলেন। এখন সকলেই স্ব-চক্ষে দেখলেন এবং বুঝলেন, ডাক্তারী বিদ্যায়ও চন্দ্রা মেয়েটির কি রকম এলেম !

অতঃপর ডাক্তার দয়াময়ের ভূমিকাধারী অধ্যাপক বীরমূর্তি দর্শকদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন ঃ এইখানেই আমাদের অভিনয়ও শেষ হলো। আপনারা এই অভিনয় দেখে শুধু চন্দ্রাদেবীকেই সব দিক দিয়ে লায়েক মেয়ে ভেবেছেন, আর—এরা সব বোকা ও বেকাম জেনে হয়ত মনে মনে ব্যথা পাচ্ছেন। কিন্তু এখন বলি—স্বল্পপরিসর মধ্যে এই বৃহৎ ও ব্যাপক বিষয়টি নিখুঁতভাবে অভিনয় করে দেখানো কঠিন। প্রকাণ্ড একটা আরোগ্যশালা হলে, এর অভিনয় আরও

চমৎকার ভাবে দেখানো সম্ভব হোত। তখন দেখতেন—নায়িকা চন্দ্রাদেবীর শিক্ষায় এই মেয়েগুলিও ডাক্তারী বিদ্যায় করিৎকর্মা হয়ে উঠেছে। কেউ দিচ্ছে ইন্‌জেকসন, কেউ চালাচ্ছে বড় বড় কার্বঙ্কল ফোড়ার ওপর ছুরি। এখন আসল কথা হচ্ছে বিদ্যাপীঠের প্রত্যেক মেয়েটি এক-একটি পাকা ডাক্তার। এইখানেই আপনাদের উদ্দেশে আমাদেরও—নমস্কার !

ডাক্তার দয়ামন অর্থাৎ ঋষিকল্প অধ্যাপক বীরমূর্তি এবং বিদ্যাপীঠের চণ্ডী প্রমুখ ছাত্রীমণ্ডলী যুক্ত করে সমবেত দর্শকবৃন্দকে নমস্কার করিলেন। বিপুল উল্লাস-ধ্বনির সহিত করতালির শব্দে সমগ্র আরোগ্য-নিকেতন মুখরিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে নীল পর্দাখানি পড়িল—যবনিকার আকারে।

॥ এগারো ॥

কিন্তু অভিনয়ের মধ্যে ভগবতী বিদ্যাপীঠের বিদূষীদের 'এলেম' দেখাইয়া চিকিৎসা বিদ্যায় তাহাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ মহলের ভুল ভাঙ্গিয়া দিবার এই অভিনব প্রচেষ্টাটি সমবেত দর্শকদের বিচারে সর্বাংশে সার্থক হইলেও পাঞ্জাব নার্সিং হোমের ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ বলিয়া মঞ্জুর করিলেন না। তিনি সভাপতি ও সমবেতগণের সমক্ষে দৃঢ়স্বরে বলিলেন : অভিনয় সব সময়েই অভিনয়। দীনদরিদ্র ব্যক্তি এখানে রূপসজ্জায় রাজা হয়ে রাজগীর পরিচয় দেয়। কস্মিনকালেও যে স্টেথিস্‌কোপ ধরেনি, ডাক্তারী শাস্ত্রে যার বর্ণ-পরিচয়ও হয়নি, সে ব্যক্তিও ডাক্তার সেজে ছুরি চালায়, প্রেস্‌ক্রিপসন্ লেখে, ইন্‌জেকসন দেয়। বিদ্যাপাঠের মেয়েরা চিকিৎসা বিদ্যার ও সেবা-শুশ্রূষার যে-সব কসরৎ দেখালেন, এও তাই—স্রেফ অভিনয়। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত নই যে, বিদ্যাপাঠের যে মেয়েটি চন্দ্রার ভূমিকায়

নেমে ডাক্তারী ব্যাপারের চূড়ান্ত দেখালেন—তাঁর ডাক্তারীতে সত্যকার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে! একটু লেখাপড়া জানে, এমন যে-কোন মেয়েকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মঞ্চে নামিয়ে তাকে পাকা লেডী-ডাক্তার প্রতিপন্ন করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। এ ধরণের ছেলে-খেলা কোন ডাক্তারের আশা পূর্ণ করতে পারে না। আমাদের নার্সিং হোম বা আরোগ্যালয়ের পক্ষ থেকেই যখন এই অনুষ্ঠানটি পালিত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে যাঁদের নিয়েই এই প্রতিষ্ঠান, তাঁদের প্রতিও আমাদের কর্তব্য আছে। সেইজন্য আমরা বিশেষভাবে ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম—এখানে সম্বর্ধনাপর্ব শেষ হবার পর প্রতিষ্ঠানের নার্সিং হোম বা আরোগ্য-ভবনটির সংলগ্ন সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠে এবং অলিন্দে আর একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে। আমন্ত্রিতগণও সেখান থেকেই আরোগ্যালয়ের পরিপূর্ণ রূপটিও যাতে দেখবার সুযোগ পান, সে ব্যবস্থাও করা হয়। আমাদের সঙ্কল্প ছিল—বিদ্যাপীঠের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বীরমূর্তি মহোদয়কে অনুরোধ করব, তাঁর ছাত্রীদের সঙ্গে—ঐ বিরাট গৃহে যে-সব রোগিণী আরোগ্যের প্রত্যাশায় রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে পরীক্ষা করে যথাযথ কর্তব্য পালন করেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে প্রস্তাবটি উত্থাপিত করবার পূর্বেই এঁদের অভিনয় প্রদর্শনের প্রস্তাবটিই গৃহীত হয়।

সভাপতি বদরিনারায়ণজী এই সময় সবিস্ময়ে বলিলেন: আপনারা যে নার্সিং হোম সম্পর্কেও এ রকম একটা ব্যবস্থা করেছেন, সে কথা ত তখন উল্লেখ করা হয়নি। বিশেষতঃ নার্সিং হোমের রোগীদের সম্বন্ধে যা-কিছু কর্তব্য, সে ত হোমের ডাক্তার ও নার্সদের করণীয় ব্যাপার। সুতরাং—

অধ্যাপক বীরমূর্তি এই সময় আসন হইতে উঠিয়া সবিনয়ে বলিলেন: মাননীয় সভাপতির অনুমতি নিয়েই আমি এই সমস্যাটির সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞ ডাক্তার যদি

সম্বর্ধনা পর্বের পরেই এই প্রস্তাবটি তুলতেন, তাহলে বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের পক্ষে "বেনাবনে মুক্তা ছড়াবার" কোন প্রয়োজনই হত না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন যে সব দর্শক এখানে উপস্থিত আছেন, আমার বিশ্বাস—তাঁরা অবশ্যই বিদ্যাপীঠের কন্যাদের নাটকীয় ভঙ্গিতে চিকিৎসা-সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষাপটুতার পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞ ডাক্তার বি এল, বি মহাশয়ের বিচারে, তাঁদের সেই প্রচেষ্টাটি যখন সাধারণ অভিনয় এবং সমগ্র ব্যাপারটি ছেলেখেলা মাত্র এ অবস্থায় তাঁর প্রস্তাবিত নার্সিং হোমে উপস্থিত আরোগ্য-প্রার্থীদের সম্বন্ধে সবার সমক্ষে হাতে-কলমে তাঁরা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতেও প্রস্তুত আছেন। এ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—আরোগ্য প্রার্থীদের সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা ত হোমের ডাক্তার ও নার্সদের করণীয় ব্যাপার, বিদ্যাপীঠের কন্যারা সেখানে কি কর্তব্য পালন করবেন? এখন আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি—বিদ্যাপীঠের কন্যাগুলিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে কষে তাদের কৃতিত্ব যাচাই করবার উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠানটির সৃষ্টি। শ্রীভগবান যখন তাঁর এই দাসকে স্রষ্টার দায়িত্ব দিয়েছেন তখন নার্সিং হোমের ডাক্তার সাহেবটির এই চ্যালেঞ্জও বিদ্যাপীঠের কন্যারা দৃঢ়তার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন—মাননীয় সভাপতি ও সমবেত সুধীবৃন্দের সমক্ষে। বন্দেমাতরম!

বিপুল পুলকোচ্ছল স্বর ও করতালির শব্দে মণ্ডপ বহুক্ষণ ধরিয়া সরব রহিল।

মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া নার্সিং হোমের দীর্ঘ সোপান শ্রেণীর সম্মুখে প্রশস্ত স্থানটিতে সবান্ধব সভাপতি, কুমার সাহেব, ডাক্তার বি, এল, বি প্রভৃতি উপস্থিত হইলে অধ্যাপক বীরমূর্তি কুমার সাহেবকে বলিলেন: বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের সাজ সজ্জার জন্য খানিকটা সময়ের প্রয়োজন—

অধ্যাপকের কথায় বাধা দিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলিলেন;

এ ত একটা সাধারণ পরীক্ষার ব্যাপার, আলাদা সাজসজ্জার কি প্রয়োজন আছে ?

বীরমূর্তি বলিলেন ঃ প্রয়োজন আছে বৈ কি। দেবালয়ে পুজা-পাঠে, ময়দানে খেলাধূলায়, তারপর যুদ্ধের ব্যাপারে, শিকারে, সাঁতারে—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সাজসজ্জা স্বতন্ত্র। এখানকার সেবিকা-দের সজ্জাও ত স্বতন্ত্র দেখছি। ডাক্তারীর সাজ সজ্জা এদেরও আছে, সঙ্গেই এসেছে। এখন চলুন—সেখানেই ওরা ডাক্তার সাজবে।

কুমার সাহেব, ডাক্তার সাহেব এবং দক্ষিণাদেবী অবাক হইয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন মাত্র। একটু পরেই দক্ষিণাদেবা বলিলেন ঃ আপনার ছাত্রীদের কোন অসুবিধা যাতে না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

এ দিনের বিরাট পরিকল্পনাটির বাস্তব রূপটি দেখিয়া সংশ্লিষ্ট মহল চমৎকৃত হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন —এ কি কাণ্ড! দীর্ঘ হল-ঘরে সজ্জিত 'বেড'গুলি আজ আর শূন্য পড়িয়া নাই—বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির এক এক নারী-মূর্তি শয্যা অধিকার করিয়া আছে। বহু কণ্ঠের যন্ত্রণাব্যঞ্জক একটা মিশ্র স্বর বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছে। কে বলিবে কুমার সাহেবের এই নার্সিং হোমটি বিশিষ্ট সহরের যে-কোন একটি বৃহৎ হাসপাতালের প্রতিচ্ছবি নহে!

কুমার সাহেব তাঁহার বন্ধুবর্গ এবং ডাক্তারের সহিত সবান্ধব সভাপতি মহাশয়কে লইয়া সেই বিস্তীর্ণ হলে উপস্থিত হইলেন। একটু পরেই দক্ষিণাদেবী অধ্যাপক বীরমূর্তি ও কন্যাগুলিকে পথ দেখাইয়া সঙ্গে করিয়া আনিলেন। বিদ্যাপীঠের পনেরটি কন্যাই একইভাবে সেবিকার উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হওয়ায় তাহাদিগকে চমৎকার মানাইতেছিল। প্রত্যেকের মাথায় য়্যাপ্রণ, পরিধেয় আটসাট বসন কটিবন্ধ দ্বারা সংযত করা হইয়াছে, গায়ের জামাগুলিও সেইভাবে প্রস্তুত।

অধ্যাপক বীরমূর্তি বলিলেন: যদিও এরা সকলে নার্সের পরিচ্ছদ পরেছে, কিন্তু এখানে চিকিৎসকরূপেই এরা কাজ করবে। এদের প্রত্যেকের কাছে স্টেথিস্‌কোপ ও থার্মোমিটার আছে। যদি কাটাকুটি বা ইন্‌জেকসনের দরকার হয়, সে-সবের যন্ত্রপাতি আপনারা সরবরাহ করবেন। রোগীগুলিকে ভাগ করে নিয়ে এরা দেখার কাজ সুরু করুক—আপনাদের তরফ থেকে এক এক ডাক্তার ও নার্স চার্ট নিয়ে সঙ্গে থাকুন। এরা রোগ ও তার ওষুধ-পথ্য বলে যাবে, সঙ্গের লোক টুকে নেবেন।

ডাক্তার বি, এল, বি, ভাবিয়াছিলেন রোগিণী-ভরা হলে আনিয়া বিদ্যাপীঠের বিদুষীদের মাথা ঘুরাইয়া দিবেন। এখন সেই বিদুষীরাই শৃঙ্খলা সহকারে প্রত্যেক রোগিণীকে দেখিতে দেখিতে রোগ ও ঔষধ-পথ্যের যে-সব নির্দেশ দিতে লাগিলেন, হলে সমবেত প্রত্যেকেই সেগুলি শুনিবার সুযোগ পাওয়ায়, তাঁহাদেরও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, চিকিৎসা ব্যাপারে প্রকৃত পক্ষেই ইহারা অভিজ্ঞা।

একটি ঘণ্টা ধরিয়া এইভাবে রোগী দেখা চলিল। ইহার মধ্যে তিনটি ইন্‌জেকসন এবং একটি ফোড়া অপারেসনও হইল। কিন্তু বিভিন্ন বয়সের কতকগুলি রোগিণী শয্যাশায়িনী অবস্থায় থাকিলেও, বিদ্যাপীঠের কন্যারা প্রথমে একে একে এবং পরে দলবদ্ধ অবস্থায় নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়াও তাহাদের রোগের কোন সন্ধান না পাইয়া সঙ্গের ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন: এঁরা কি সখ করে নার্সিং হোমে নার্সদের সেবা নিতে এসেছেন? আপনি এঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন নি? কিম্বা আমাদের জন্যই এ পরীক্ষা?

ডাক্তারের মুখখানা এই প্রশ্নে চূণের মত সাদা হইয়া গেল। দক্ষিণাদেবী তাঁর কালো মুখখানা আরো কালো করিয়া বলিলেন: যে যাই করুক, শেষ পর্যন্ত আপনারাই জিতে গেছেন। এখন

এদের চালাকির কথা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া বা চেপে যাওয়া আপনাদের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করছে।

চণ্ডীই অগ্রবর্তিনী হইয়া বলিল: আপনাদের এই নূতন প্রতিষ্ঠানটির ক্ষতি হয়, এমন কাজ আমরা করব না। তা'ছাড়া, এতগুলি মেয়েকে সবার সামনে ছোট করাও আমাদের ইচ্ছা নয়।

তৎক্ষণাৎ সঙ্গের ডাক্তারটির হাত হইতে চার্টটি টানিয়া লইয়া চণ্ডী তাহাতে লিখিয়া দিল—'নার্সিংহোমের সত্তরটি রোগিণীর মধ্যে ত্রিশটি ভদ্রমহিলা রোগিণী সাজিয়া শয্যার আশ্রয় লইলেও ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। যদি এ ক্ষেত্রে বলা হয়—ইঁহারা অভিনয় করিতে আদিষ্টা হইয়াছেন, তথাপি আমরা বলিব যে, তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। এখন ইঁহাদিগকে স্ব স্ব আলয়ে পাঠাইয়া দিয়া রোগিণীর অভাবে শয্যাগুলি খালি রাখাই শ্রেয়ঃ। এই আরোগ্যশালার পরিচালক পক্ষকে বিখ্যাত সংস্কৃত প্রবচনটির অনুধাবন করিতে আমরা অনুরোধ জানাইতেছি—'বরং শূণ্যাশালা ন চ খলু বরং দুষ্টবৃষভঃ।'

কুমার সাহেব এই সময় দক্ষিণাদেবীর, মুখের পরিবর্তিত অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারেন, চালাকিটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত অধৈর্যভাবে বলিয়া উঠিলেন: যথেষ্ট হয়েছে—আর নয়। ডাক্তার না হলেও আমার যেটুকু জানা শোনা আছে, তাতে বুঝতে পারছি—অদ্ভুত, এঁরা সত্যই অদ্ভুত। এখন ডাক্তারের কিছু বলবার আছে কি?

কিন্তু ডাক্তারকে নিরুত্তর দেখিয়া বীরমূর্তি বলিলেন: কুমার সাহেব যদি সম্মতি দেন, তাহলে আমি নিজেই আপনার ডাক্তারটিকে পরীক্ষা করি।

প্রখর দৃষ্টিতে বীরমূর্তিকে বিদ্ধ করিয়া ডাক্তার বলিলেন: আমার পরীক্ষা করবার আগে একজন স্পেশ্যাল রোগীকে অধ্যাপক যদি পরীক্ষা ক'রে তার রোগ বাতলে দিতে পারেন, তাহলে আমাকেই পরীক্ষা করা হবে।

অধ্যাপক সহাস্যে শুধাইলেন: একজন স্পেশ্যাল রোগী? কি ব্যাপার বলুন ত? শুনিছি, এখানে শুধু রোগিণীরাই স্থান পান; রোগীর ব্যবস্থাও আছে নাকি?

কুমার সাহেব বলিলেন: দেখতেই ত পাচ্ছেন, বাড়িখানার কি অবস্থা; এখনো একটা প্রকাণ্ড ব্লক খালি পড়ে আছে। এখন স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় পুরুষদের জন্যও একটা বিভাগ খোলবার ইচ্ছা আছে।

ডাক্তারও ঝাঁ করিয়া কুমার সাহেবের কথার পীঠে বলিয়া ফেলিলেন: এখন হয়েছে কি, নমুনা স্বরূপ বিশিষ্ট ঘরের একটি রোগী নিজেই উদ্যোগী হয়ে এখানে এসে পড়ায়, এদিকে একখানা ঘরে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর জন্যে একটা 'বেড'এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসে অবধি একটা যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছেন, তবে তাঁর যে কি রোগ আমরা সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না, যদিও অনুমান করে ওষুধও খাইয়েছি, ইন্‌জেকসনও দিয়েছি, কিন্তু কিছুই হয়নি। এখন, আপনি যদি একবার রোগীকে দেখে—

ইতিমধ্যে চণ্ডীও তাহার সহকর্মিণীদের সহিত এই অংশে আসিয়া ডাক্তারের কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। ডাক্তারের প্রস্তাবটি শেষ হইবার পূর্বেই চণ্ডী বাধা দিয়া বলিল: আমরা এখানে উপস্থিত থাকতে আমাদের গুরুজীকে ও-সব নোংরা ব্যাপারে যেতে দেব না। আপনার সেই স্পেশ্যাল রোগীকে আমরাই আগে দেখতে চাই। যদি ব্যর্থ হই, তখন গুরুজী দেখবেন।

সভাপতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিলেন: এত খুবই ভাল প্রস্তাব। আমি সমর্থন করছি।

ডাক্তার কিন্তু মুখখানা ভার করিয়া বলিলেন: কিন্তু আমার প্রস্তাবটি শুনেই বিদ্যাপীঠের এই মুখরা মেয়েটি ব্যাপারটাকে নোংরা বলে উল্লেখ করে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সবার সমক্ষে অপদস্থ করলেন কেন, সেকথা জিজ্ঞাসা করতে আমি বাধ্য।

দক্ষিণাদেবীও রোগিণীদের চার্টবহনকারী ডাক্তারটির সঙ্গে

বিদ্যাপীঠের কন্যাদের পিছনে পিছনেই এখানে আসিয়া ডাক্তারের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তিনিই তাড়াতাড়ি পাশেরডাক্তারের নিকট হইতে চার্টখানি লইয়া বলিলেনঃ ডাক্তারের এই আপত্তির উত্তরে আমি নার্সিংহোমের ত্রিশটি রোগিণীর সম্বন্ধে বিদ্যাপীঠের মুখপাত্রী চণ্ডীদেবীর মন্তব্যটি পড়ছি, তাহলেই বোঝা যাবে—কেন উনি এমন একটা কড়া কথা বলেছিলেন।

চণ্ডীর লিখিত মন্তব্যটির বিশিষ্ট শব্দগুলির উপর জোর দিয়া দক্ষিণাদেবী এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের মুখখানা অন্ধকার হইয়া গেল। সমবেত দর্শকদের ভিতর হইতেও সমস্বরে বিভিন্ন কণ্ঠের নিন্দাসূচক ধ্বনিও উঠিল।

চণ্ডী কিন্তু এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে কোন কথা না বলিয়া ডাক্তারের দিকে চাহিয়া সহজ ভাবেই বলিলঃ আপনার সেই স্পেশ্যাল রোগীর ঘরে নিয়ে চলুন—আমরা তাঁকে দেখব।

ডাক্তারও আর কথা না বাড়াইয়া একবার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে দক্ষিণাদেবীর মুখের পানে চাহিয়া পরক্ষণে কর্কশকণ্ঠে চণ্ডীর উদ্দেশ্যে বলিলেন আসুন।

নার্সিংহোমের সুবিস্তীর্ণ অলিন্দ হইতে খানিকটা তফাতে কুমার সাহেবের মহল্লার মুখে একখানি সুসজ্জিত ঘর। এখানে পালঙ্কের উপর শুভ্র শয্যায় বিশাল আয়তনের এক স্থূলকায় ব্যক্তি শায়িত অবস্থায় ব্যাধিক্লিষ্ট শিশুর মত অস্থিরভাবে ছটফট করিতেছিল। ডাক্তারের নির্দেশমত তাঁহার সঙ্গে বিদ্যাপীঠের চণ্ডী ও তাহার কতিপয় সহকর্মিণী মাত্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটির সামনের দিকের পরস্পর সংলগ্ন বড় বড় দরজাগুলি কুমার সাহেবের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দিতেই বাহিরের সুপ্রশস্ত সুদীর্ঘ স্থানটিতে অনুসরণ-কারীরাও সমবেত হইয়া ভিতরের অবস্থা দেখিবার সুযোগ পাইলেন।

চণ্ডী তাহার দুইটি সহকর্মিণীর সহিত সেই অস্থির রোগীটির শয্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র রোগীর অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি

পাইল। মুখখানা বিকৃত করিয়া বড় বড় দুটি আয়ত-চোখে চণ্ডীর দিকে তাকাইয়া সে ভাঙাগলায় অশুদ্ধ হিন্দীতে বলিয়া উঠিল ভাগ হিঁয়াসে—ভাগ্। ডাগদার সাবকো বোলাও! আওরৎ লোগঁকো নহি মাংতা—ভাগ্।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ রোগীর শয্যাস্পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন: এঁরাও ডাগদার জী! লেডী ডাগ্‌দার—সেবা-করনে-ওয়ালী, ঘাবড়াইয়ে মৎ—

চণ্ডী এই সময় জিজ্ঞাসা করিল: রোগীর মেজাজের তাপ ত দেখছি, গায়ের তাপটা কি দেখেছেন?

ডাক্তার তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর করলেন: দেখবেন ত আপনারাই। আমি শুধু দুটো কথা বলে মেজাজটা ওঁর ঠাণ্ডা করে দিলাম।

চণ্ডীও শ্লেষের সুরে বলিল: ঠাণ্ডা করবার দাওয়াই আমাদেরও জানা আছে ডাক্তার!

আড়চোখে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন: তাই নাকি? বেশ, সেই দাওয়াই দিন—আমরাও বাঁচি।

চণ্ডী এই সময় থলির ভিতর হইতে থার্মোমিটারটি লইয়া খাপ হইতে যন্ত্রটি বাহির করিতেছিল। সহসা অশিষ্ট রোগী তাহার দীর্ঘ হাতখানা বাড়াইয়া চণ্ডীর হাতের উপর সজোরে চালনা করিতেই চণ্ডীও সঙ্গে সঙ্গে খপ করিয়া ঘরের মেঝেয় পাতা কার্পেটটির উপর বসিয়া পড়িল। সেই অবস্থায় রোগীর হাতের দীর্ঘ পাঞ্জাটি চণ্ডীর মাথার য়্যাপ্রণটাকে নামাইয়া দিল।

পরক্ষণে চণ্ডী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি রোগীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া শাসাইল: ফের যদি আপনি হাত চালান, কিংবা কোনরকম বদমাইসি করেন, তাহলে হাতে পায়ে লোহার শিকল বেঁধে আমরা পরীক্ষা করব। মনে রাখবেন, আমারা ডাক্তার; ডিউটির সময় কারও খাতির করি না।

সেই দৃষ্টি একইভাবে রোগীর মুখে টর্চের আলোর মত ফেলিয়া

সঙ্গিনীদের সাহায্যে চণ্ডী থার্মোমিটার রোগীর উর্দ্ধাঙ্গে প্রয়োগ করিয়া উত্তাপ লইল। রোগীকে আর কোন প্রকার উপদ্রব করিতে দেখা গেল না। যন্ত্রটি ডাক্তারের চোখের উপর ধরিয়া চণ্ডী বলিল: দেখছেন—নর্মাল!

রোগীকে চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল: কি কষ্ট হচ্ছে আপনার?

রোগা সারা মুখে দারুণ কষ্টের চিহ্ন ফুটাইয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া জানাইল যে, তাহার দেহের ভিতরটা জ্বলিয়া যাইতেছে—দম লইতেও কষ্ট পাইতেছে।

চণ্ডী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল: আপনি কি কি ঔষুধ দিয়েছেন?

ডাক্তার একখানা কার্ড রোগীর শয্যাসংলগ্ন টিপয় হইতে লইয়া চণ্ডীর হাতে দিয়া বলিলেন: এতে সব লেখা আছে। আগে পাউডার খাইয়েছিলাম, তার পর এই ইন্‌জেকসনটা দিই।

চণ্ডী ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল: আপনি আসল রোগটাই ধরতে পারেননি, সেই জন্যেই ওষুধ আর ইন্‌জেকসনে কোন কাজ হয় নি। আমি এঁর রোগ ধরেছি; সারতে গোটাতিনেক ইন্‌জেকসনের ওয়াস্তা।

ডাক্তার জিজ্ঞাস করিলেন: কি ইন্‌জেকসন দেবেন?

গম্ভীর মুখে চণ্ডী বলিল: পয়জন—পোটাসিয়াম সায়নাইড।

সবিস্ময়ে ডাক্তার বলিলেন: কি সর্বনাশ—পয়জন? বিষ?

সহজ ভাবেই চণ্ডী উত্তর করিল: হ্যাঁ—বিষ। দেখছেন না—বিষের জ্বালায় রোগীর সর্বাঙ্গ জ্বলছে। এখন আরো উগ্র বিষই এঁর পক্ষে মহৌষধ—বিষে বিষক্ষয় হবে। আমার থলিতে সে বিষ আছে। এখন ইন্‌জেকসন দেবার ব্যবস্থা করুন।

আশ্চর্য, চণ্ডীর মুখে এই সাংঘাতিক কথা শুনিয়াই সেই দারুণ অশান্ত ও অস্থির প্রকৃতি রোগী একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

দুই চোখে দারুণ আতঙ্ক ভরিয়া সে তখন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল
ক্যা মুস্কিল! বিষ—

চণ্ডীও সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল: হাঁ—বিষ। কিন্তু মুস্কিল বলছেন কেন? যথার্থ ই যখন আপনার দেহের ভিতরটা জ্বলছে, বিষ পড়লেই দেখবেন, তখুনি জল হয়ে গেছে। তবে যদি আপনার দেহের জ্বলুনি মিছে হয়, তাহলে ঐ বিষ দেহের রক্তের সঙ্গে মিশলে উলটো উৎপত্তি হবে—তৎক্ষণাৎ মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে, আর দম ছুটে মারা পড়বেন।

চণ্ডীর মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিশালকায় অদ্ভুত রোগী প্রকাণ্ড মুখখানার এক অপরূপ ভঙ্গি করিয়া যুক্ত করে অতিকষ্টে আবেদন জানাইল: মাপ কী জীয়ে জী—মাপ কী জীয়ে। ঝুট্-ঝুট্—সব ঝুট মুট হ্যায়! তবিয়ৎ হামারা আচ্ছি হ্যায়, খুশ হ্যায়, বড়িয়া হ্যায়—মাপ কী জীয়ে!

চণ্ডী ও তাহার সহকর্মিনীদের মুখগুলি তখন তরল হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে। সেই হাসির আলো ডাক্তারের অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখখানার উপর ছড়াইয়া চণ্ডী বলিল: এই জন্যেই আমি এ ব্যাপারটিকে নোংরা বলেছিলাম ডাক্তার! তারপর, এখানে এসেই রোগীকে একনজরে দেখেই মন্তব্য করেছিলাম—রোগ আমি ধরেছি। আর, রোগীও তার রোগের কথা নিজেই স্বীকার করেছেন।

রোগী এই সময় হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি করিয়া ডাক্তারের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল: ইয়ে বিলকুল ডাগডার সাবকো লীলা হ্যায় জী।

বাহিরে সমবেত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ মন্তব্য করিলেন: বিদ্যাপীঠের দেবীরা ডাক্তার সাহাবের মুখের মুখোস খুলে দিয়েছেন। তাঁর চালাকিও ফেঁসে গেছে।

এই সময় সভাপতি মহাশয় বলিলেন: সভাপতি হলে একটা ভাষণ দিতে হয়, কিন্তু আজ আমি যে কাণ্ড দেখলাম, বা অভিজ্ঞতা

পেলাম, তাতে গলার স্বর বন্ধ হচ্ছে। আমি শুধু অধ্যাপকজীর এই মহীয়সী ছাত্রীগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নমস্কার জানাচ্ছি। এঁরা নারীমূর্তিতে প্রত্যেকেই—ভগবতী।

কুমার সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন: আমিও অধ্যাপকজীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি—আমাদের সব ত্রুটি ক্ষমা করে, প্রসন্নমনে এই ভগবতীগুলি আমাদের নার্সিংহোমকে দান করুন—আমি তাহলে এঁদের হাতেই এই প্রতিষ্ঠানটি চালাবার ভার ছেড়ে দিই।

শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে অধ্যাপক বীরমূর্তি বলিলেন: আমিও সসম্মানে কুমার সাহেবের মর্যাদা রেখে নিবেদন করছি, তাঁর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার সামর্থ্য আমার নেই। কারণ, আমার ছাত্রীদের শিক্ষাকাল শেষ হয়েছে, একটি যুগের উপর যবনিকা পড়বার আগেই এরা নিজেদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাবে—সেখানেই সুরু হবে নূতন সাধনা।

শেষ